অভ্যুদয়ের বই

জাঙ্গল লোর

জিম করবেট

(শিকারী জীবনের অভিজ্ঞতা)

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭১

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

ছেপেছেন
বৈদ্যনাথ ঘোষ
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস
৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছে
চারু খান

প্রচ্ছদ ছেপেছে
মডার্ন প্রসেস

১

আট থেকে আঠারো বছর বয়সের চোদ্দ জন ছেলেমেয়ে আমরা কালাঢুঙ্গির বোয়র নদীর পুরানো কাঠের পোলের এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ড্যান্‌সের ভূতের গল্প শুনছি। আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে কাঠকুটো এনে আমরা মাঝখানে যে আগুন তৈরি করেছিলাম তা নিভে গিয়ে কেবল রক্তিম আভা অবশিষ্ট, অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ড্যান্‌সে যে তার গল্প বলার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে নিয়েছে তা বোঝা যায় যেভাবে জনৈকা শ্রোত্রী তার নার্ভাস সঙ্গিনীকে ধমক দিয়ে বলছে: 'অমন করে বার-বার পেছন দিকে তাকিয়ো না, বড় অস্বস্তি বোধ হয়।'

ড্যান্‌সে হল আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ, হাজার রকম অন্ধ বিশ্বাসে তার আপাদ-মস্তক ভর্তি। আর এ সমস্ত সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত বলেই ভূতের গল্প তার মুখে অত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত। তার সে-রাত্রের গল্পের বিষয়বস্তু হল যত সব আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া মূর্তি, হাড়ের ঠকঠকানি, রহস্যজনক উপায়ে দরজা খুলে যাওয়া আর বন্ধ হওয়া, আর পূর্বপুরুষদের বাড়ির প্রাচীন কাঠের সিঁড়িতে মচ-মচ্ শব্দ। কিন্তু পূর্ব-পুরুষদের ভূতে পাওয়া-বাড়ি ঘর দেখবার সম্ভাবনা তো আমার নেই, ড্যান্‌সের ভুতুড়ে গল্প শুনে তাই আমার কোন ভয় হত না। এইমাত্র সে তার সবচেয়ে রক্ত-জমাট-করা গল্প শেষ করেছে আর মেয়েটি আবার তার নার্ভাস সঙ্গিনীকে পেছন ফিরে তাকাবার জন্যে ধমক দিয়েছে, এমন সময় একটা বুড়ো শিঙাল পেঁচা একটা বাজ-খাওয়া হলদু গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে গলা ছেড়ে ডেকে উঠল, তারপর বোয়র নদীতে মাছ আর ব্যাঙ ধরার নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। যে মরা গাছটাকে নিশানা করে আমরা গুলতি আর প্রজাপতির জাল নিয়ে অভিযানে বেরোতাম, সেই লতায় ছাওয়া মরা গাছটার ডালে বসে সারাটা দিন সে ঝিমোয়। পেঁচার এই ডাককে অজ্ঞ লোকে বাঘের ডাক বলে ভুল করে থাকে। এই ডাকের সাড়া দেয় তার সঙ্গিনী, সে থাকে (মিলনের সময় ছাড়া অন্য সময়ে) খালের ধারের একটা পিপল গাছের উপরে। এই ডাককে অজুহাত করে ড্যান্‌সে তার ভূতের গল্প শুরু করে, কারণ তার মতে বন্‌শীরা হল ভূতের চেয়েও বেশি বাস্তব এবং বেশি ভয়াবহ। ড্যান্‌সে বলে বন্‌শী হল এক ধরনের পেত্নী, গভীর বনে তার বাস; আর সে এমন সাঙ্ঘাতিক যে তার

নাম উচ্চারণ করলেই শ্রোতার ও তার আত্মীয়দের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা এবং তাকে যে চোখে দেখবে তার নির্ঘাত মৃত্যু। ড্যান্‌সে বলে বন্‌শীর ডাক হল একটা একটানা দীর্ঘ চিৎকার; সাধারণত অন্ধকার রাত্রে ঝঞ্ঝার সময়েই তার সেই চিৎকার শোনা যায়। বন্‌শীর ভয়াবহ গল্পগুলোর একটা আকর্ষণ আমার কাছে ছিল, কারণ যেসব জঙ্গলে আমি পাখির আর পাখির ডিমের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম এইসব গল্পে ছিল সেই সব জঙ্গলের আবহাওয়া।

আয়ার্ল্যাণ্ডে থাকতে ড্যান্‌সে যে বন্‌শী শুনেছিল, তার কী চেহারা সে দেখেছিল আমার জানা নেই; তবে, কুমায়ুনের জঙ্গলে তার শোনা দুটো বন্‌শীর চেহারা আমি দেখেছি। এই দুটোর একটার কথা আমি পরে বলব, আর অন্যটার কথা তো হিমালয়ের পাদদেশের বাসিন্দাদের সকলেরই জানা আছে। ভারতের অন্যত্রও নেহাত অজানা নয়; সে হল চুরাইল। সমস্ত অপদেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সে; সে দেখা দেয় স্ত্রীলোকের বেশে। সাপ যেমন করে পাখিকে অবশ করে, কোন মানুষের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সেও ঠিক তেমনিভাবেই তাকে সম্পূর্ণ অবশ করে ফেলে। তার পায়ের পাতা আবার উল্টো দিকে ফেরানো। পেছন দিকে হাটতে হাটতে সে তাকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই, এই স্ত্রীলোকের দেখা পাবার সম্ভাবনা হলে তা এড়াবার একমাত্র উপায় হল—হাত দিয়ে হোক, এক টুকরো কাপড় দিয়ে হোক কিংবা যদি ঘরের ভিতরে হয় তাহলে কম্বল-মুড়ি দিয়ে হোক চোখদুটোকে ঢেকে ফেলা।

গুহা-মানব যুগের মানুষদের ব্যাপারটা যাই হোক, বর্তমান যুগের মানুষ আমরাও আসলে দিবালোকের সন্তান। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ততক্ষণ আমরা ঠিক থাকি, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ভীরু সেও পর্যন্ত প্রয়োজন হলে যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে এবং এমন অনেক ব্যাপার হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও যার কথা ভেবে তার সারা শরীর শিউরে উঠেছিল। দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকার যখন আমাদের ঘিরে আসে এবং দৃষ্টি যখন চলে না, আমরা তখন হই কল্পনার উপর নির্ভর করতে বাধ্য। এবং কল্পনাশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন, প্রায়ই দেখা যায় তা নির্ভুল হয় না; এবং কল্পনার সঙ্গে যখন অলৌকিকে দৃঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয় তখন তো আর কথাই নেই। যাদের চারদিকে কেবল ঘন জঙ্গল, চলাচলের একমাত্র উপায় যাদের পা এবং রাত্রের দৃষ্টির সীমানা (তেল মিললে) হারিকেনের আলোর পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্ধকারকে তাদের ভয় করাই স্বাভাবিক।

জান

মাসের পর মাস ঐ সব মানুষের সঙ্গে বাস করার আর কেবল তাদেরই ভাষায় কথা বলার ফলে ড্যান্‌সের নিজের অন্ধবিশ্বাসের উপর আবার ওদের অন্ধবিশ্বাস এসে পড়েছিল। আমাদের পাহাড়িদের সাহসের অভাব ছিল না, আর ড্যান্‌সেও ছিল প্রচুর সাহসী; কিন্তু এইসব অন্ধবিশ্বাসের ফলে পাহাড়িরা বা ড্যান্‌সে কেউই কখনো খোঁজ করে দেখেনি কোন্‌টা পাহাড়িদের মতে চুরাইল আর কোন্‌টা ড্যান্‌সের মতে বন্‌শী।

কুমাওনে অত বছর বাস করে আর শত-শত রাত জঙ্গলে কাটিয়ে মাত্র তিন বার আমি চুরাইলের ডাক শুনেছি, তিনবারই রাত্রে, আর দেখেছি মাত্র একবার।

তখন মার্চ মাস। সবেমাত্র সরষের ফসল কাটা হয়েছে, চমৎকার ফলেছে এবার। গ্রামের মাঝখানে আমাদের কুটির ঘিরে প্রচুর খুশির গুঞ্জন উঠছে। স্ত্রী পুরুষ সবাই গান ধরেছে, ছেলেমেয়েরা এ-ওকে ডাকছে। পূর্ণিমার আর দু-এক দিন মাত্র বাকি, চাঁদের আলো প্রায় দিনের মত ফুটফুটে। ম্যাগি আর আমি ভাবছি ডিনারের ব্যবস্থা করতে বলব, আটটা বাজে—এমন সময় তীক্ষ্ণ আওয়াজে রাতের বাতাস খান-খান করে চুরাইলের ডাক শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল গ্রামের সমস্ত শব্দ। আমাদের কুটির থেকে পঞ্চাশ গজ মত তফাতে, প্রাচীরের ডান কোণে আছে বহু প্রাচীন এক হল্‌দু গাছ। যুগ যুগ ধরে কত শকুন, বাজপাখি, চিল আর চকচকে কাস্তে-চরা উপরের ডালের ছাল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একে মেরে ফেলেছে। উত্তুরে হাওয়ার ভয়ে সামনের দরজাটা বন্ধ ছিল, আমি আর ম্যাগি বেরিয়ে গেলাম সেটা খুলে বারান্দায়, আর অমনি চুরাইলটা আবার ডেকে উঠল। শব্দটা এল হল্‌দু গাছটা থেকে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল চুরাইলটা গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে রয়েছে।

কোন-কোন্ শব্দকে কিছু অক্ষর বা কথা সাজিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব,—যেমন, মানুষের ডাকা 'কুঈ' আর কাঠঠোকরার-'ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ' শব্দ। কিন্তু চুরাইলের ডাক সেভাবে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি বলি এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে কোন অত্যাচারিত আত্মার, বা কোন যন্ত্রণা-কাতর মানুষের, তাতে পাঠকের কিছুই বোধগম্য হবে না, কারণ তা শোনবার অভিজ্ঞতা পাঠকের বা আমার হয় নি। জঙ্গলের কোন শব্দের সঙ্গেও এর কোন তুলনা সম্ভব নয়। কারণ এ শব্দ একেবারে অন্যরকম। পার্থিব জগতের সঙ্গে যেন এর কোন সম্বন্ধ নেই। এ শব্দ শুনলে রক্ত জমাট হয়ে যায়, হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে। আগে যতবার এ ডাক শুনেছিলাম, আমি বুঝেছিলাম এ হল কোন পাখির ডাক—হয় প্যাঁচার, কিংবা কোন যাযাবর পাখির; কারণ কুমাওনের সমস্ত পাখি আর

তাদের ডাক আমার জানা ছিল ; আমি জানতাম বনের কোন প্রাণীর ডাক এ নয়। ঘরে গিয়ে একটা দূরবীন নিয়ে ফিরে এলাম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্যে এর ব্যবহার হত, সুতরাং বলা বাহুল্য জিনিসটা ভাল। এটা চোখে লাগিয়ে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলাম। যা দেখলাম তার একটা বর্ণনা দিচ্ছি—এই আশায় যে, আমার চেয়ে ওয়াকিবহাল কোন মানুষ হয়ত তা থেকে একে চিনতে পারবে।

(ক) সোনালি ঈগলের থেকে এর আকৃতি একটু ছোট।

(খ) লম্বা লম্বা পায়ে এ সোজা দাঁড়িয়ে থাকে।

(গ) এর ল্যাজ ছোট, কিন্তু প্যাঁচার ল্যাজের মত অত ছোট নয়।

(ঘ) এর মাথা প্যাঁচার মাথার মত অত গোল বা অত বড় নয়, ঘাড়ও তেমন ছোট নয়।

(ঙ) এর মাথায় কোন শিং নেই।

(চ) যখন এ ডাকে (ঠিক আধ মিনিট অন্তর এ ডাকে), মাথাটা আকাশের দিকে ফিরিয়ে, হাঁ করে ডাকে।

(ছ) এর রঙ একেবারে কালো, কিংবা হয়ত ঘোর বাদামি—চাঁদের আলোয় অমন কালো দেখায়।

আমার একটা ২৮ বোর শট-গান আছে আর বন্দুকের তাকে একটা হালকা রাইফেল আছে। বন্দুকটা এখন কাজে আসবে না কারণ পাখিটা তার নাগালের বাইরে ; আর রাইফেলটা ব্যবহার করতে আমার সাহস হচ্ছে না, কারণ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তো নির্ভুল গুলি ছোড়ার সম্ভাবনা অল্প, তাই যদি আমি ব্যর্থ হই তাহলে যারা গুলির শব্দ শুনবে তারা আরও নিশ্চিত হবে যে এ ডাক যে ডেকেছে নিশ্চয় সে কোন অপদেবতা, রাইফেলের গুলি পর্যন্ত যার কিছু করতে পারে না। বার-কুড়ি অমনি ডাকার পর পাখিটা ডানা মেলে রাত্রির আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে রাতে আর গ্রাম থেকে কোন সাড়া মিলল না, এবং পরের দিন কেউ চুরাইলের নাম উচ্চারণ করল না। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বন্ধু চোরাই শিকারী কুঁয়র সিং আমায় সাবধান করে দিয়েছিল, 'বাঘকে কখনো বাঘ বলে ডেকোনা, ডাকলেই সে এসে হাজির হবে।' সেই একই কারণে এই তরাইয়ের মানুষরা কখনো চুরাইলের নাম করত না।

শীতের ক-টা মাস কালাঢুঙ্গিতে কাটাতে আসা আমাদের দুটো বড় পরিবারের তরুণদের সংখ্যা হল চোদ্দ,—অবশ্য আমার ছোট ভাইকে বাদ দিয়ে, কারণ রাত্রে বনে ঘুরে বেড়ানো বা নদীতে স্নান করার বয়স তার হয় নি। এই চোদ্দ জনের মধ্যে সাত জন মেয়ে—তাদের বয়স নয় থেকে আঠারো, আর সাত জন ছেলে, তাদের বয়স আট থেকে আঠারো—আমি হলাম বয়সে সবার ছোট। এবং ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক হওয়ার ফলে এমন কতগুলো কাজ আমার ঘাড়ে পড়ত যা আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগত। আমরা সেকেলেদের মত জীবন যাপন করছিলাম; আমাদের চৌহদ্দির ধারে যে খাল ছিল মেয়েরা সেখানে রবিবার ছাড়া প্রত্যেক দিন স্নান করতে যেত (কেন যে মেয়েরা রবিবার স্নান করত না জানি না) এবং এমন একজন পুরুষ মানুষের তাদের সঙ্গে যাবার দরকার হত যাকে ওদের লজ্জা করত না। আমার কাজ ছিল মেয়েদের তোয়ালে আর রাতের পোশাক বয়ে নিয়ে যাওয়া (তখনকার দিনে সাঁতারের পোশাক ছিল না), আর কোন পুরুষ ওদিকে এলে মেয়েদের সাবধান করে দেওয়া। জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে বা দরকার হলে খালটা মেরামত বা পরিষ্কার করার কাজে মানুষ এপারে ওপারে যাওয়া আসা করত, ফলে সেখানে একটা পায়ে-চলা পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খালটা ছিল বাঁধানো, দশ ফুট চওড়া আর তিন ফুট গভীর, বাগানে জল-সেচ ব্যবস্থার জন্যে খালের কয়েক গজ পর্যন্ত ছ-ফুট গভীর করা হয়েছিল। এটা করিয়েছিলেন কুমাওনের রাজা জেনারেল হেনরি র‍্যামজে। প্রতিদিন মেয়েদের নিয়ে যাবার সময় আমাকে সাবধান করে দেওয়া হত, যেন আমি লক্ষ্য রাখি যাতে ওরা কেউ গভীর জলে গিয়ে ডুবে না যায়। পাতলা সুতোর রাত্রিবাস পরে স্রোতের জলে আব্রু বজায় রেখে স্নান করা সহজ কাজ নয়, কারণ যখনই কেউ অসাবধানে তিন ফুট জলে নেমে বসে পড়ে (জলে নামামাত্র সব মেয়েরাই যা করে থাকে), সঙ্গে-সঙ্গে রাত্রিবাস ফুলে মাথার উপর উঠে পড়ে, আর তা দেখে দর্শকের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। এহেন অবস্থায় আমার উপর কড়া হুকুম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে তাকাতে হবে।

যখন আমি মেয়েদের পাহারা দিচ্ছি আর দরকার-মত থেকে থেকে অন্য দিকে তাকাচ্ছি, অন্য সব ছেলেরা সেই সময়ে গুলতি আর ছিপ নিয়ে খালের যেদিকটা গভীর সেদিকে এগিয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে

প্রতিযোগিতা হচ্ছে পথের ধারের শিমুল গাছটার সবচেয়ে উঁচু ফুলগুলো কে পাড়তে পারে, বা খাল-ধারের বট গাছে কে সবার আগে গুলতি ছুঁড়তে পারে এই নিয়ে—এক বারের বেশি দু-বার কেউ গুলতি ছোড়ার সুযোগ পাবে না। গুলতি লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে দুধের মত আঁটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে। পাখি ধরবার আঠা হিসেবে এই আঠাই হল সবচেয়ে ভাল। তা ছাড়া গুলি করার মত কত পাখিই না আছে—কাঞ্চন, দামা, দোয়েল, হলদে পাখি ইত্যাদি, যারা শিমুল ফুলের মধু খায়। তা ছাড়া সাধারণ, বা স্লেট রঙের, বা লাল-ঝুঁটি মদনা, যারা এ ফুল ঠুকরে ঠুকরে সামান্য একটু খেয়ে বাকিটা ফেলে দেয় আর হরিণ বা শুয়োরছানা এসে সেটা খেয়ে ফেলে, ঝুঁটিওলা বগবাহার মাছরাঙারা যারা তাড়া পেলে জলের উপর আস্তে আস্তে ভেসে চলে, আর শিঙাল প্যাঁচাটা তো আছেই—যার জোড়া বুয়র সেতুর অপর পারে থাকত। এই প্যাঁচাটা থাকত খালের-জলে-ঝুঁকে-পড়া পিপল গাছটার একটা ডালে। এই প্রাণীটাকে কক্ষনো কেউ তার গুলতির পাল্লার মধ্যে পায় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই কেউ-না-কেউ তাকে লক্ষ্য করে গুলতি ছুড়েছে। ঘন ঘাসের এলাকাটার কাছে পৌঁছে তখন প্রবল প্রতিযোগিতা চলত ছিপ ফেলে কে কত বেশি মাছ ধরতে পারে। এই মাছ ধরা হত বাড়িতে মা বা বোনের কাছ থেকে সুতো চেয়ে নিয়ে, আর যাদের বঁড়শি কেনার পয়সা জুটত না তারা আলপিন বেঁকিয়ে বঁড়শি তৈরি করে নিত। আর ছিপ হত কঞ্চি কেটে। এই মাছ ধরা চলত যতক্ষণ না সমস্ত টোপ ফুরিয়ে যেত বা অসাবধানে জলে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত। কয়েকটা মহাশের মাছ ধরার পর (কারণ খালে মাছের কোন অভাব ছিল না) তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছেড়ে সবাই গিয়ে উঠত খালের-জলে-ঝুঁকে-পড়া মস্ত পাথরটার উপর, আর তারপর সঙ্কেত পাওয়ামাত্রই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতা হত, কে আগে খাল পার হতে পারে। সবাই যখন এইসব চমৎকার চমৎকার খেলায় ব্যস্ত আমি সেই সময় এক মাইল নিচে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার হুকুম তামিল করছি কিংবা হয়ত মাথায়-কাঠের-বোঝা কোন বৃদ্ধের আগমনের সঙ্কেত না করার জন্যে ধমক খাচ্ছি। এই জবরদস্তি কর্তব্য পালনের ফলে একটা সুবিধে যা আমার হত সে হল, ছেলেদের কে, বিশেষ করে ড্যান্‌সে আর নীল ফ্লেমিংকে জব্দ করবার জন্যে মেয়েদের মতলবগুলো সব আগে থেকে জানতে পারা।

ড্যান্‌সে আর নীল দু-জনেই আইরিশ, দু-জনেই পাগলাটে। কিন্তু ওদের মধ্যে মিল ঐ পর্যন্তই। ড্যান্‌সে হল বেঁটে, রোমশ, আর গ্রিজলি ভাল্লুকের মত

শক্তিশালী, আর নীল হল লম্বা, নমনীয় আর পদ্মফুলের মত সুন্দর। পার্থক্য শুধু এইটুকুই নয়; কারণ ড্যান্‌সে নির্ভাবনায় গাদা বন্দুক হাতে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘের সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু নীলের জঙ্গলকে ভয়ঙ্কর ভয়, কখনো সে বন্দুক ছোঁড়েনি। আর যে বিষয়ে দুজনের মধ্যে মিল সে হল পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ—কারণ দু-জনেই সমস্ত মেয়েদের প্রেমে একেবারে পাগল। ড্যান্‌সের বাবা ছিলেন জেনারেল, সৈন্যদলে যোগ দিতে রাজি না হওয়ায় তিনি ড্যান্‌সেকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। আমার দাদাদের সঙ্গে সে সাধারণ স্কুলে পড়াশুনো করেছিল। এখন তার অবস্থা হল এই—বন-বিভাগের চাকরি তার গেছে, সে আশা করে আছে কবে সে রাজনৈতিক দপ্তরে একটা চাকরি পেতে পারে। আর নীল চাকরি করে, তার চাকরি হল পোস্ট অফিসে আমার দাদা টমের সহকারী হিসেবে কাজ করা। অর্থাৎ বিয়ে করবার মত সঙ্গতি স্বপ্নের অতীত এ কথা জানা সত্ত্বেও মেয়েদের প্রতি তাদের টান বা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা একটুও কমে নি।

খালের ধারের কথাবার্তা যা কানে আসত তা থেকে আমি বুঝতাম যে কিছুদিন আগে কালাঢুঙ্গি থেকে ফিরে অবধি নীল নিজেকে খুব কেউ-কেটা মনে করছে আর কল্পনায় অনেক কিছু করছে, আর ড্যান্‌সে খুব দমে আছে, নিজেকে জাহির করার কোন উৎসাহ পাচ্ছে না। এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্যে তখন ঠিক করা হল যে নীলকে বেশ খানিকটা নামিয়ে আনতে হবে, আর সেইসঙ্গে ড্যান্‌সেকে একটুখানি তুলে ধরতে হবে। একটুখানি কিন্তু, বেশি নয়; কারণ না হলে আবার সেও কল্পনায় অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করবে। এই 'কল্পনায় অনেক কিছু ভাবার ব্যাপারটা বুঝতাম না, কিন্তু আমার মনে হল এ কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। এই দুই উদ্দেশ্য একসঙ্গে সার্থক করতে হলে দরকার একই কৌশলে দু-জনকে জব্দ করা। অনেক পরামর্শের পর যে কৌশল সাব্যস্ত হল তা সার্থক করতে আমার দাদা টমের সাহায্য দরকার। শীতের ক-মাস নৈনিতালে কাজের তেমন চাপ থাকে না, টম তাই নীলকে এক সপ্তাহ অন্তর শনিবার থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ছুটি দিত। এই ছোট্ট ছুটিটা নীল কাটাতো দুই পরিবারের কোন একটির সঙ্গে, কারণ তার সুন্দর ব্যবহার আর চমৎকার কণ্ঠস্বরের জন্যে দুই পরিবারেই সে ছিল সুস্বাগত। মতলব-মত টমকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হল যেন সে কোন অছিলায় আগামী শনিবার নীলকে একটু আটকে রাখে, আর এমন সময় ছেড়ে দেয় যাতে এই পনেরো মাইল পথ হেঁটে কালাঢুঙ্গিতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। টমকে আরও লিখে দেওয়া

হল সে যেন নীলকে একটা ইঙ্গিত দেয় যে তার দেরি দেখে মেয়েরা ভয় পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে আসবে। বিরাট মতলবটা হল, একটা ভাল্লুকের চামড়ায় ড্যান্‌সেকে মুড়ে সেলাই করে দিয়ে মেয়েরা নিয়ে যাবে নৈনিতালের পথে দু-মাইল দূরে যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ অনেকখানি বেঁকে গেছে। এখানে একটা পাথরের আড়ালে ড্যান্‌সে লুকিয়ে থাকবে, আর নীল এলেই ভাল্লুকের মত গর্জন করে উঠবে। হঠাৎ ভাল্লুক দেখেই নীল সোজা রাস্তা ধরে দৌড়তে শুরু করবে আর যেসব মেয়েরা তার প্রতীক্ষায় রয়েছে তাদের প্রসারিত হাতের মধ্যে গিয়ে পড়বে, তার কাহিনী শুনে তারা কাপুরুষতার জন্যে ধিক্কার দেবে এবং মিনিটখানেক পরে যখন ড্যান্‌সেও এসে পড়বে তখন প্রচণ্ড হাসিতে সবাই ফেটে পড়বে। ড্যান্‌সে প্রথমটা আপত্তি করেছিল, কিন্তু রাজি হল যখন সে শুনল যে দিন-পনেরো আগে এক চড়ুইভাতিতে হ্যামের স্যাণ্ডউইচে যে লাল ফ্ল্যানেল দিয়ে তাকে বিব্রত করা হয়েছিল সেটা নীলের মতলবেই হয়েছিল।

কালাঢুঙ্গি-নৈনিতাল রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যায় নিজের পোশাকের উপর ভাল্লুকের চামড়ায় মোড়া ড্যান্‌সেকে নিয়ে মেয়েরা নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। কখনো চার হাতে পায়ে, কখনো বা দু-পায়ে হেঁটে ড্যান্‌সে চলল ওদের সঙ্গে। যখন এসে পৌছল ঘামে তার সারা শরীর ভিজে গেছে। আর এদিকে একটার পর একটা কাজ এসে পড়ায় নীল খুব বিরক্ত হচ্ছিল। এইভাবে কখন তার বেরোবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যখন তার ছুটি হল, টম তার শটগানটায় দুটো গুলি পুরে নীলের হাতে দিল। সাবধান করে দিল, যেন নিতান্ত দরকার না হলে গুলি খরচ না করে। নৈনিতাল থেকে কালাঢুঙ্গির রাস্তা প্রায় সমস্তটাই ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। তার প্রথম আট মাইলের মাঝে-মাঝে শস্য-ক্ষেত আর পরের রাস্তাটা মোটামুটি ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কিছুক্ষণ হল ড্যান্‌সে আর মেয়েরা তাদের জায়গায় এসে পৌছেছে। আলো কমে আসছে ক্রমেই। এমন সময় শোনা গেল নীল সাহস বজায় রাখবার জন্যে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। গানের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মেয়েরা পরে বলেছিল নীল নাকি এত ভাল গান আর কখনো গায়নি। তারপর মোড় ফিরে ডান্‌সে যেখানে লুকিয়ে ছিল তার কাছে এসে পৌছতেই ড্যান্‌সে পেছনের পায়ে ভর করে ভাল্লুকের মত গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীল বন্দুক বাগিয়ে দুটো গুলিই ছেড়ে দিল একসঙ্গে। ধোঁয়ার

একটা ঝলক উঠে নীলের চোখ অন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নীল দৌড়তে শুরু করল এবং দৌড়তে দৌড়তে শুনতে পেল ভাল্লুকটার গড়িয়ে পড়ে যাবার শব্দ। সেই মুহূর্তে মেয়েরা দৌড়ে এলে তাদের দেখে নীল বন্দুক আস্ফালন করে বললে এইমাত্র সে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুককে গুলি করে মেরেছে—ভাল্লুকটা তাকে ভীষণভাবে তাড়া করে এসেছিল। সন্ত্রস্ত মেয়েরা যখন জিজ্ঞাসা করল ভাল্লুকটার কী হয়েছে, পাহাড়ের নিচের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে নীল তাদের বললে তার সঙ্গে গিয়ে সেটাকে দেখতে। বললে কোন ভয় নেই, ভাল্লুকটা মরে গেছে। মেয়েরা রাজি হল না, নীলকে বললে একাই গিয়ে দেখে আসতে। নীলের তখন কোন কিছুতেই আপত্তি নেই—মেয়েদের চোখের জল দেখে সে মনে করেছে যে সে ভাল্লুকের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় তারা আনন্দাশ্রু মোচন করছে। গেল সে একাই। ড্যান্‌সের আর নীলের মধ্যে সেখানে কী কথাবার্তা হয়েছিল আমরা জানি না, তবে অনেকক্ষণ পরে যখন দেখা গেল ওরা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে যেখানে মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, তখন ড্যান্‌সের হাতে বন্দুক আর নীলের হাতে ভাল্লুকের চামড়াটা। গায়ে ভাল্লুকের চামড়া থাকায় খাড়াই পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়েও ড্যান্‌সে আহত হয়নি। ড্যান্‌সে বললে নীল বুকে গুলি করে তাকে ফেলে দিয়েছে, আর নীল বললে যে বন্দুকের গুলিতে আর একটু হলেই এক মহা বিপদ ঘটত,—বললে কিভাবে সেটা তার হাতে আসে। সমস্ত দোষটা তখন গিয়ে পড়ল অনুপস্থিত টমের উপরে।

সোমবার ছিল ছুটির দিন, তাই যখন টম রবিবার রাত্রে ছুটিটা কাটাবার জন্যে এসে পৌঁছল, ক্রুদ্ধ মেয়ের দল তাকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে নীলের মত মানুষের হাতে গুলি-ভরা বন্দুক দিয়ে এভাবে ড্যান্‌সের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। চুপ করে টম শুনল যতক্ষণ না মেয়েরা শান্ত হল, তারপর যখন সে শুনল ড্যান্‌সে বুকে গুলি লেগে পড়ে যেতে কিভাবে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তার অকাল মৃত্যুতে কান্নাকাটি করেছে, হো-হো করে হেসে উঠে টম সকলকে হকচকিয়ে দিল, আর তারপর যখন সে সকলকে বুঝিয়ে দিল কিভাবে চিঠিটা পাওয়া অবধি দুষ্টুমির গন্ধ পেয়ে সে কার্তুজ থেকে গুলি বার করে তা ময়দা দিয়ে ভরে রাখে, তখন কেবলমাত্র ড্যান্‌সে ছাড়া সকলেই তার সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দিল। বিরাট মতলবটার মোট ফলাফল যা আন্দাজ করা গিয়েছিল দেখা গেল তা হল না, কারণ এর ফলে নীল বরং আরও ফুলে উঠল আর ড্যান্‌সে আরও চুপসে গেল।

২

মেয়েদের সঙ্গে আমি থাকতাম বলে ড্যান্‌সে ভেবেছিল বুঝি আমিও এই ভাল্লুকের ব্যাপারের মধ্যে ছিলাম। এ ধারণা কিন্তু তার ঠিক নয়। কারণ আমি শুধু বলেছিলাম সাধারণ সুতোয় না করে টোয়াইন সুতোয় ভাল্লুকের চামড়াটা সেলাই করতে, এবং এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই পর্যন্তই। আমার এ কথা নিশ্চয় সে বিশ্বাস করেছিল, তা না হলে কেন সে একদিন সকালে আমায় তার সঙ্গে শিকারে যেতে বলবে। আমি তখন সঙ্গীদের দেখিয়ে দিচ্ছিলাম কিভাবে গাছের একটা ডাল থেকে ঝুলতে ঝুলতে আরেকটা ডালে চলে যাওয়া যায়। এত বড় সম্মান পেয়ে আমি তখন একেবারে খুশির সপ্তম স্বর্গে; বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে। বেরোবার পর সে বললে আমায় দেখাবে কিভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতে হয়। ধুনিগাবের বেত-ঝোপের কাছে গিয়ে দেখলাম সেখানে অনেক বাঘের পায়ের দাগ রয়েছে (পরে শুনেছিলাম এ জায়গাটা বাঘেদের একটা আড্ডা), কিন্তু কোন বাঘের দেখা মিলল না। ড্যান্‌সে ছিল আমাদের পরিবারের বন্ধু, ফেরার পথে সে ঠিক করল আমায় বন্দুক ছুড়তে শেখাবে। এ কথা যখন সে বললে আমরা তখন ফাঁকা জায়গাটার এ প্রান্তে, এর অপর পারে কয়েকটা সাদা-মাথা দামা পাখি (এই পাখিগুলো হাসে) শুকনো পাতা সরিয়ে সরিয়ে উইপোকা খুঁজে ফিরছে। শিকারে বেরোবার সময় ড্যান্‌সে গাদা রাইফেলটা হাতে, আর শটগানটা (সেটাও গাদা) কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিল। এখন সে শটগানটা কাঁধ থেকে নামিয়ে আমার হাতে দিয়ে পাখিগুলোকে দেখিয়ে দিল। বাঁ পা-টা ডান পায়ের একটু সামনে রাখতে বললে, তারপর বললে বন্দুকটা কাঁধে তুলে স্থিরভাবে ধরে ঘোড়া টিপে দিতে। তাই করলাম। এই ব্যাপারের পর এত বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি জানি না বন্দুকটা ড্যান্‌সে বিশেষ করে আমার জন্যেই খুব বেশী করে গেদেছিল, না কি অসীম শক্তিশালী ড্যান্‌সের অভ্যাসই ছিল খুব বেশি করে বন্দুক গাদা। যাই হোক, বন্দুকের ধাক্কা সামলে উঠে যখন চারদিকে তাকাবার মত অবস্থা আমার হল, দেখলাম ড্যান্‌সে বন্দুকটার নলদুটোর উপর হাত বুলিয়ে দেখছে সেদুটো জখম হয়েছে কি না। গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাই তখন

বন্দুকটা আমার হাত থেকে ছিটকে পাথরের উপর পড়েছিল। দামাগুলো সব উড়ে পালিয়েছিল, কিন্তু যেখানে তারা চরছিল, দেখলাম একটা সাদা-কপালে মক্ষিভুক্ পাখি সেখানে পড়ে আছে—দোয়েল পাখির মত তার আকৃতি। পাখিটার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকায় ড্যান্‌সে সিদ্ধান্ত করল, নিশ্চয় সে শব্দেই মারা গেছে। আমিও ড্যান্‌সের সঙ্গে একমত হলাম, কারণ আমার নিজেরও প্রায় সেই অবস্থাই হতে বসেছিল।

এই অভিজ্ঞতার কিছুদিন পরে আমার বড় ভাই টম একদিন বললে আমায় নিয়ে ভাল্লুক-শিকারে যাবে। আমার যখন চার বছর বয়স তখন বাবা মারা যান, সেই থেকে টমের উপর আমাদের সংসারের দায়িত্ব। শুনে মাতো হতভম্ব হয়ে পড়লেন। জোন অব্ আর্ক আর নার্স ফ্যাভেল-এর সাহস একসঙ্গে করলে যা হতে পারে মা-র সাহস তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু তাহলেও তিনি ঘুঘু পাখির মত কোমল। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে আমি টমের কথা শুনছিলাম। টম ছিল আমার কিশোর হৃদয়ের উপাস্য বীর। মাকে সে বুঝিয়ে বললে যে এর মধ্যে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই, সে আমাকে সাবধানে রাখবে যাতে আমার কোন অনিষ্ট না হয়। শেষ পর্যন্ত মায়ের অনুমতি পেয়ে আমি ঠিক করলাম টমের খুব কাছে-কাছে থাকব, তাহলেই আর কোন ভয় থাকবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম,—টম তার রাইফেল ছাড়াও আমার জন্যে একটা বন্দুক নিয়েছে। জীবজন্তুদের একটা চলা-পথ ধরে আমরা চলেছি—পথটা গেছে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর দিয়ে। পাহাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে আমরা একটা গভীর, অন্ধকার দরিপথের সামনে এলাম।

দরিপথটা দেখে সুবিধের মনে হল না। সেটার ধারে এসে দাঁড়িয়ে টম আমায় ফিস-ফিস করে বললে এ জায়গাটা ভাল্লুকদের খুব প্রিয়, তারা দরিপথ দিয়ে কিংবা যে পথে আমরা এলাম এই পথে চলা-ফেরা করে। তারপর সেই পথের ধারের একটা পাথর দেখিয়ে আমায় সেখানে বসতে বলে বন্দুকটা আর দুটো গুলি আমার হাতে দিল। এই বলে আমায় সাবধান করে দিল যে ভাল্লুকটাকে যেন একেবারে মেরে ফেলি, কেবলমাত্র আহত না করি। তারপর সেখান থেকে প্রায় আটশো গজ তফাতে পর্বতের কাঁধটার কাছে যেখানে একটা ওক গাছ নিরালা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা দেখিয়ে দিয়ে বললে সে সেখানে যাচ্ছে; যদি আমি কোন ভাল্লুককে তার

কাছে দেখতে পাই যাকে দেখতে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে যেন আমি গিয়ে তাকে খবরটা দিই। এই বলে সে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

বাতাস বইছে, সেই বাতাসে শুকনো ঘাস আর ঝরা পাতার সর-সর শব্দ হচ্ছে। চারদিকের জঙ্গল আমার কল্পনায় ক্ষুধার্ত ভাল্লুকে ভাল্লুকে ভরে উঠল—সেই শীতকালে এই পাহাড়ে ন-টা ভাল্লুক মারা হয়েছিল)। এক্ষুনি যে আমায় ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না এবং তার সে ভোজ যে আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে তাতেও সন্দেহ নেই। সময় যেন আর কাটতেই চায় না, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক বেড়ে চলেছে। অস্তসূর্যের ঝরনায় সমস্ত পাহাড় রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। এমন সময় দেখলাম একটা ভাল্লুক টমের গাছের থেকে কয়েকশো গজ উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে। টম তা দেখেছে কি না সে দুর্ভাবনা আমার একটুও রইল না, এই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে পালাবার এই হল সেই সুযোগ যার প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, এবং এখনও সময় আছে। তাই বন্দুকটা কাঁধে করে আমি টমকে ভাল্লুকটার খবর দিতে গেলাম। ড্যানসের ব্যাপারের পর আর আমি বন্দুকটা ভরে নিতে সাহস করলাম না।

আমাদের এদিককার হিমালয়ের ভাল্লুক সারা শীতকাল ওক গাছের ফল খেয়ে কাটায়। ভাল্লুক অত্যন্ত ভারি, আর এই ফল ফলে ওক ডালের সবচেয়ে উঁচুতে; তাই ফল খেতে হলে ভাল্লুককে এই ডাল নিচু করে গাছের গুঁড়ির দিকে নিয়ে যেতে হয়। ফলে এইসব ডালের কোনটা কেবল ফেটে যায় এবং তার পরও অনেকদিন কাঁচা থাকে, কোনটা একেবারে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়, কোনটা বা ভেঙে গিয়ে কেবলমাত্র ছালে আটকে ঝুলতে থাকে। দরিপথ অতিক্রম করে একটা ঘন ঝোপের কাছে এসে পৌঁছতে হঠাৎ একটা খস-খস শব্দ আমার কানে এল। ভয়ে জমে গিয়ে আমি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে রইলাম। শব্দটা ক্রমেই জোর হয়ে উঠতে লাগল, আর পরক্ষণেই একটা প্রকাণ্ড পদার্থ সশব্দে আমার সামনে পড়ল। দেখলাম এ একটা গাছের ডাল, কোন ভাল্লুক এটা আগে থেকে ভেঙে রেখেছিল, এখন হাওয়ার বেগে পড়ে গেল। কিন্তু এ যদি এশিয়ার সবচেয়ে বড় ভাল্লুকও হত তাহলেও আমি এত ভয় পেতাম না। যে সাহসে ভর করে আমি টমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তা আর বিন্দুমাত্র রইল না, ফলে আবার আমি গুঁড়ি মেরে পাথরটার কাছে ফিরে গেলাম। সুস্থ মানুষের পক্ষে যদি আতঙ্কে

মারা যাওয়া সম্ভব হত তবে সে রাত্রে (এবং তার পরেও আরও অনেকবার) আমি নির্ঘাত মারা পড়তাম।

অস্ত-সূর্যের রক্তিম আভা পাহাড় থেকে মিলিয়ে গেল, শেষ আলোও আকাশ থেকে চলে গেল। এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি দেখা দিল, আর একটা প্রফুল্ল স্বর আমায় ডেকে বললে, 'কিরে, ভয় পাসনি তো?' কথাটা বলে আমার বন্দুকটা নিজের হাতে নিল। উত্তরে যখন আমি বললাম এখন আর মার ভয় করছে না, টম আর এ নিয়ে কথা বাড়ালো না, কারণ বুদ্ধি-সুদ্ধি তার যথেষ্ট ছিল, ব্যাপার-স্যাপার সব বুঝতে ভাল।

শিকারে যাবার সময় টম সর্বদাই ছিল তাড়াতাড়ি বেরোবার পক্ষপাতী। যেদিন সে আমায় ময়ূর শিকারে নিয়ে যায়, ভোর চারটেয় বিছানা থেকে তুলে বললে নিঃশব্দে হাত-মুখ ধুতে আর জামাকাপড় পরতে যাতে কারুর না ঘুম ভেঙে যায়, এবং আধঘন্টা পরেই এক এক কাপ গরম চা আর ঘরে তৈরি কিছু বিস্কুট খেয়ে আমরা অন্ধকারের মধ্যে সাত মাইল হাঁটা-পথ ধরে গারুপ্পুর দিকে রওনা হলাম।

আমার জীবনে আমি তরাই আর ভাবর-এর জঙ্গলে অনেক পরিবর্তন দেখেছি। এর কিছু হয়েছে মানুষের হাতে, কিছু হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কোন-কোন ঘন বনে, আগে যেখানে মানুষের পা পড়ে নি, এখন সেখানে কেবল ঝোপ-ঝাড়, আর যে-সব জায়গায় ছিল কোমর-সমান ঘাস আর ফুলের ঝোপ সেখানে এখন জঙ্গল। গারুপ্পুর দক্ষিণ-পূর্বে যেখানে আগে (অর্থাৎ যখনকার কথা লিখছি) ছিল কোমর-সমান ঘাস আর ফুলের ঝোপ, এখন সেখানে বড়-বড় গাছের জঙ্গল। ডিসেম্বরের সেই সকালে টম এই অঞ্চল দিয়ে চলেছিল; কারণ এই সময় কুল পাকে, সে লোভ সামলানো কেবলমাত্র হরিণ আর শুয়োরের পক্ষেই নয়, ময়ূরের পক্ষেও একরকম অসম্ভব।

গারুপ্পুতে যখন পৌছলাম তখনও অন্ধকার থাকায় আমরা কুয়াটার কাছে বসে পুব আকাশে ধীরে ধীরে আলোর আভাস লক্ষ্য করলাম, বনের জেগে ওঠার সাড়া পেলাম। চারদিক থেকে লাল বনমোরগের ডাক শোনা গেল। সেই ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল অসংখ্য ছোট-ছোট পাখির, আর তারাও পালক থেকে শিশির আর চোখ থেকে ঘুম ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে নতুন দিনের আবাহনে মোরগদের সঙ্গে গলা মেলালো। যেসব ময়ূর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ছড়ানো বিরাট বিরাট শিমুল গাছের ডালে ডালে বিশ্রাম করছিল এবার তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে শব্দমুখর জঙ্গলের সঙ্গে তাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যুক্ত করল, আর যখন ভোরের প্রথম আলো শিমুল গাছের মগডাল স্পর্শ করল,

কুড়ি-পঁচিশটা ময়ূর যারা. ডালে ডালে ভিড় করেছিল সবাই কুল-ঝোপের কাছে নেমে গেল।

উঠে দাঁড়াল টম। তারপর পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বললে এবার বনে প্রবেশ করার সময় হয়েছে। এই নিচু এলাকায় শিশির প্রায় ত্রিশ ফুট পর্যন্ত ছেয়ে থাকে, তাই ভোরবেলা বড়-বড় গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে গাছের পাতা থেকে যে জল ঝরে. শব্দ শুনে বা চোখে দেখে তাকে বৃষ্টি বলেই মনে হয়। রাস্তা থেকে নেমে য ঘাসের ভিতর দিয়ে আমরা চললাম তা টমের কোমর পর্যন্ত আর আমার থুতনি পর্যন্ত উঁচু; শিশির-ভেজা সেই ঘাসের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে আমার ভিজে পোশাক গায়ে লেপটে গিয়ে সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রচুর অস্বস্থির সৃষ্টি করল। যেখানে আমি থেমেছিলাম সেখান থেকে ময়ূরটা পাল্লার বাইরে। এ কথার উত্তরে যখন বললাম আমি গুলি করতে যাই নি কেবল ঘোড়াটা তুলে নিচ্ছিলাম, টম বললে কক্ষনো তা করা উচিত নয়, ঘোড়া তোলা উচিত ঠিক গুলি করবার সময়-টাতে,—ভাবে ঘোড়া তুলে এগোনো বিপজ্জনক, বিশেষ করে যখন যেখান দিয়ে চলেছি সেখানে অদৃশ্য গর্তে পা পড়ে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। 'এবার যাও,' বললে টম, 'দেখ চেষ্টা করে।' এবার আমি ময়ূরটাকে সহজেই পাল্লার মধ্যে পেলাম, একটা বড় ফুলের ঝোপ মাঝখানে পড়ায় আর কোন অসুবিধে হয় নি। শিমুল গাছটায় পাতা না থাকলেও লাল রঙের বড় বড় ফুল ফুটে ছিল। গাছটার আমার দিকের একটা ডালের উপর বসে ছিল ময়ূরটা—সূর্যের টেরচা রোদ তার উপর পড়তে মনে হল, এত চমৎকার ময়ূর আমি আর দেখিনি কখনো। এবার ঘোড়াটা তোলার সময় এসেছে; কিন্তু উত্তেজনার বশেই হোক কিংবা আমার অসাড় আঙুলগুলোর জন্যেই হোক, কিছুতেই আমি সেটা তুলতে পারলাম না। ভাবছি এবার কী করা যায়, কিন্তু এমন সময় ময়ূরটা উড়ে গেল। আমার কাছে এসে টম বললে, 'যাক গে, পরের বার তুই নিশ্চয় পারবি।' কিন্তু সেদিন সকালে আর কোন পাখি গাছে বসে আমায় কৃতার্থ করল না। টম একটা লাল বন-মোরগ আর তিনটে ময়ূর মারবার পর আমরা জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় উঠলাম। তারপর বাড়ি ফিরে যখন প্রাতরাশে বসলাম তখন বেলা হয়ে গেছে।

৩

যে তিনটে পাঠের কথা বললাম সেইসঙ্গেই আমার জঙ্গলের শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ হল,—বড়দের তরফ থেকে অন্তত। বন্দুকের ব্যবহার আমাকে শেখানো হয়েছে, বাঘ ভাল্লুক আছে এমন বনে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জন্তু আহত নয় তাকে ভয় করবার কিছু নেই। যে শিক্ষা ছেলেবেলায় ভাল করে হয় সারা জীবন তা মনে থাকে, এবং আমার সমস্ত শিক্ষা ভাল করেই হয়েছিল। এখন থেকে যে-কোন রকমের শিকারে এই শিক্ষার সুবিধে গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন, এবং তা যে আমি গ্রহণ করেছিলাম এজন্যে আমি খুশি।

ছোটদের যে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম হয় তা নয়, তাই যেদিকে যাদের প্রবণতা, শরীরের সামর্থ্য অনুযায়ী তা তাদের বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত—এবং যদি উৎসাহের অভাব থাকে বা প্রাণনাশে বিতৃষ্ণা থাকে, তাহলে শিকারের লাইন একেবারে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। যত প্রচ্ছন্নভাবেই হোক, জবরদস্তির ফলে তাতে করে, আমার মনে হয়, যে-কোন ধরনের খেলাধুলোর ব্যাপারেই অনেকখানি আনন্দ খর্ব হয়ে পড়ে।

নিউমোনিয়ার সঙ্গে এক মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে মা আর বোনদের সাহায্যে টম আমাকে শেষ পর্যন্ত সারিয়ে তুলেছিল। যে জীবন আমি হারাতে বসেছিলাম, যাতে আমি তাতে উৎসাহ পাই সেজন্যে টম আমাকে একটা গুলতি করে দিলে। আমার বিছানার পাশে বসত সে, পকেট থেকে গুলতিটা বার করে খাটের পাশ থেকে গোমাংসের জুসের কাপটা তুলে নিয়ে বলত, এটা খেলে তবে আমার গায়ে গুলতি ছোড়াব মত জোর হবে। সেই থেকে আমাকে যা দেওয়া হত বিনা প্রতিবাদে আমি তা খেতাম। ক্রমে আমার গায়ের জোর ফিরে আসছে দেখে টম বাড়ির আর সকলকেও বললে জঙ্গলের গল্প বলে বলে আমার উৎসাহ জাগিয়ে রাখতে। গুলতির ব্যবহারেও আমার শিক্ষা অগ্রসর হতে লাগল।

টমের কাছেই আমি শিখি যে শিকারীদের পক্ষে বছরটা দুই ঋতুতে বিভক্ত—বন্ধ ঋতু আর খোলা ঋতু। বন্ধ ঋতুতে আমায় গুলতি তুলে রাখতে হত, কারণ পাখিরা তখন বাসা বাঁধে। যখন ডিমে তা দিচ্ছে বা বাচ্চাদের মানুষ করে তুলছে সে সময়ে তাদের হত্যা করা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ। খোলা ঋতুতে

আমার যেমন ইচ্ছে গুলতি ব্যবহারে বাধা ছিল না, কিন্তু এই শর্ত ছিল যে, যে পাখি মারব সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। হরিয়াল বা নীল পাহাড়ি পায়রা আমাদের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রচুর মিলত, সেগুলো মারতে বাধা ছিল না, কারণ সেগুলো ছিল খাদ্য। কিন্তু আর যে সব পাখি মারব তাদের ছাল ছাড়িয়ে ঠিক করে রাখতে হবে। তাই যখন সময় হল টম আমায় একটা ছাল ছাড়ানোর ছুরি আর আর্সেনিক সাবান দিল। ট্যাক্সিডার্মি বিদ্যায় টম বিশেষ নৈপুণ্যের দাবি করত না বটে, তবে, একটা পুরুষ কালিজ নিয়ে সে আমায় পাখির ছাল ছাড়ানো সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে দিয়েছিল। ষ্টিফেন ডীজ নামে আমাদের এক আত্মীয় কুমায়ুনের পাখিদের নিয়ে যে বই লিখছিল তার চারশো আশিটা রঙিন ছবির বেশির ভাগই হয়েছিল হয় আমার সংগ্রহের পাখি থেকে বা এই উদ্দেশ্যে যে সব পাখি আমি তার জন্যে বিশেষভাবে সংগ্রহ করেছিলাম তা থেকে।

টমের দুটো কুকুর ছিল। পপি ছিল লাল রঙের কুকুর। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় সেটা কাবুলের পথে না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছিল, সেটাকে সে ভারতে নিয়ে আসে। আর ম্যাগগের লেজ ছিল পেখমের মত। ছোট ছেলেদের নিয়ে পপির কোন মাথা-ব্যথা ছিল না, কিন্তু ম্যাগগের গায়ে বেশ জোর ছিল, আমায় পিঠে নিয়ে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত যেতে পারত। শুধু আমার দেখা-শোনা বা চলাফেরার ভারই নয়, তার সমস্ত স্নেহ সে আমার উপর ঢেলে দিয়েছিল। ম্যাগগই আমায় শিখিয়েছিল এমন কোন ঘন ঝোপের খুব কাছ দিয়ে না যেতে যেখানে জীবজন্তুরা ঘুমিয়ে থাকে, পাছে ঘুম ভেঙে গেলে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। সে-ই আমায় দেখায় যে কুকুরও চেষ্টা করলে বেড়ালের মত নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে চলা-ফেরা করতে পারে। ম্যাগগের কাছে ভরসা পেয়ে আমি এমন গহন জঙ্গলেও গিয়েছি যেখানে যেতে আগে আমার সাহস হত না। আমার যখন গুলতির যুগ চলছিল সেই সময় একবার আমাদের এমন এক সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হয় যার ফলে ম্যাগগ প্রায় মারা পড়তে বসেছিল।

আমার সংগ্রহের জন্যে একটা বিশেষ পাখির সন্ধানে সেদিন সকালে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এমন সময় ড্যান্‌সের সঙ্গে দেখা। তার কুকুর স্কটি থিস্‌লের সঙ্গে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল। তারাও আমাদের দলে যোগ দিল। কুকুরদুটোর মধ্যে সদ্ভাব না থাকলেও যাই হোক তারা লড়ল না।

কিছুদূর যাবার পর থিস্‌ল্ একটা শজারুকে দেখে তাড়া করল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগগও, আমার বারণ সত্ত্বেও। ড্যান্‌সে তার গাদা বন্দুক নিয়ে গিয়েছিল,

কিন্তু পাছে কুকুরগুলোর গায়ে লাগে এই ভয়ে সে গুলি করতে সাহস করল না, কারণ কুকুরদুটো শজারুটার দু-দিকে এক লাইনে ছুটছিল আর তাকে কামড়াবার চেষ্টা করছিল। দৌড়ের ব্যাপারে ড্যান্‌সে বিশেষ ওস্তাদ ছিল না, তার উপর তার হাতে আবার বন্দুক। ফলে শজারুটা, কুকুরদুটো আর আমি তাকে অনেকটা পেছনে ফেলে গেলাম। শজারুর সঙ্গে কারবার বড় সহজ নয়। তারা তাদের কাঁটা ছুড়ে দিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহলেও তারা যেমন শক্ত তেমনি দ্রুতগতি। আক্রমণের বা আক্রমণ প্রতিরোধের সময় তারা তাদের গায়ের কাঁটাগুলো খাড়া করে তোলে, আর ছোটে পেছন দিকে।

শজারুটাকে তাড়া করবার আগে আমি গুলতিটা পকেটে পুরে একটা শক্ত লাঠি হাতে নিয়েছি, কিন্তু কুকুরদের কোনরকম সাহায্য করাই আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যখনই আমি শজারুটার কাছাকাছি হয়েছি সে আমায় তেড়ে এসেছে, এবং বহুবার আমি কুকুরদুটোর দৌলতে তার কাঁটার আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছি। আধমাইলটাক তাড়া করবার পর আমরা একটা গভীর দরিপথের কাছে গিয়ে পৌছলাম যেখানে শজারুদের গর্ত আছে। এবার তারা শজারুটাকে ধরে ফেলল। ম্যাগগ তার নাক কামড়ে ধরল, আর থিস্‌ল্ তার গলাটা। ড্যান্‌সে যখন এসে পৌছল তখন লড়াই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবুও সে নিশ্চিত হবার জন্যে শজারুটাকে একটা গুলি করল। দুটো কুকুরেরই গা দিয়ে প্রচুর রক্ত গড়াচ্ছে। যতগুলো কাঁটা পারলাম তাদের গা থেকে খুলে নিলাম, তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলাম, যাতে যে সব কাঁটা ভেঙে ভিতরে থেকে যাওয়ার ফলে অনেক চেষ্টাতেও খালি হাতে বার করতে পারি নি চিমটে দিয়ে সেগুলো বার করতে পারি, কারণ শজারুর কাঁটায় খোঁচা খোঁচা কাঁটা-মত থাকে, ফলে তা টেনে বার করা কঠিন হয়ে ওঠে।

সারা দিন সারা রাত ম্যাগগের অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটল। খুব ঘন-ঘন সে হাঁচতে থাকল, আর যতবার হাঁচল প্রতিবারই তার খড়ের বিছানায় চাপ-চাপ রক্ত পড়তে লাগল। সৌভাগ্যবশে পরদিন ছিল রবিবার। ছুটি কাটাতে টম নৈনিতাল থেকে এল। দেখল সে, একটা শজারু-কাঁটা ম্যাগগের নাকের ভিতর ভেঙে রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যখন সে চিমটে দিয়ে ভাঙা কাঁটাটা বার করল, দেখা গেল সেটা লম্বায় ছ-ইঞ্চি, আর কলমের মত মোটা। সঙ্গে সঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল এবং সে রক্ত যখন কিছুতেই বন্ধ করতে পারল না, টমের আশঙ্কা হল আর বুঝি ম্যাগগকে বাঁচাতে পারা যাবে না। যাই হোক প্রচুর যত্ন আর ভাল খাওয়া-দাওয়ার ফলে ম্যাগগ সেরে উঠল। থিস্‌ল্

ততটা আহত হয় নি, সেও অবিলম্বে ভাল হল।

গাদা বন্দুকটা পাবার পর—সে কথা পরে বলব—ম্যাগগকে আর আমাকে দু-বার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এর একটা হয় কালাঢুঙ্গিতে, আর একটা নৈনিতালে। নয়া গাঁও গ্রামের কথা পাঠককে আগে বলেছি। সে সময়ে তার ক্ষেত পুরোটা চাষ করা হত। এই ক্ষেত আর ধুনিগার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে একফালি জঙ্গল, তার মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। জঙ্গলটা হল সিকি মাইল থেকে আধ মাইল চওড়া; এই জঙ্গলের ভিতরে আছে অসংখ্য লাল বন-মোরগ, ময়ূর, হরিণ আর শুয়োর। প্রচুর শস্য এরা নষ্ট করত। ক্ষেত থেকে যেতে আসতে তারা শিকারের জন্তুর পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে চলত। এই পায়ে-চলা পথেই ম্যাগগ আর আমি আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করি।

নয়া গাঁও হল আমাদের কালাঢুঙ্গির বাড়ি থেকে তিন মাইল। একদিন আমি ম্যাগগকে নিয়ে খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম ময়ূরের সন্ধানে। চওড়া রাস্তাটার মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি, কারণ তখনও আলো ভাল করে ফোটে নি, এবং এ জঙ্গল হল চিতাবাঘ আর বাঘের আস্তানা। রাস্তাটা যেখানে সেই পায়ে-চলা পথে গিয়ে মিশেছে সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সূর্য উঠছে। এবার বারুদ ভরবার পালা। এ এক সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার; প্রথমে বারুদটা মেপে নল দিয়ে ঢেলে দেওয়া, তারপর একটা পুরু বনাত দিয়ে শক্ত করে গেদে দেওয়া। এরপর গুলিটা মেপে নিয়ে সেই বনাতের উপর ঢেলে দিতে হবে আর পাতলা পীচবোর্ড গুলির উপর চেপে দিতে হবে। যখন দেখা যাবে গাদনকাঠিটা নল থেকে ছিটকে আসছে তখন বুঝতে হবে যে ঠিকমত গাদা হয়েছে। উদ্ভট মস্ত ঘোড়াটা তখন অর্ধেকটা তুলতে হবে আর শক্ত করে আটকাতে হবে। এতগুলো ব্যাপার যখন আমার মনের মত করে সমাধা হল তখন গাদবার যন্ত্রপাতি পিঠঝুলিতে ভরে নিয়ে ম্যাগগ আর আমি জন্তুর চলা-পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কতকগুলো বন-মোরগ আর ময়ূর আমাদের পথের উপর দিয়ে চলে গেল, কিন্তু গুলি করার ভাল সুযোগ কেউ দিল না। আধ-মাইলটাক যাবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গার সামনে এসে পৌঁছলাম। সেখানে পা ফেলতে দেখি সাতটা ময়ূর একটার পেছনে একটা এইভাবে ফাঁকা জায়গাটার ওপার দিয়ে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত বিশ্রামের পর আমরা গুঁড়ি মেরে গেলাম যেখান দিয়ে ময়ূরগুলি গিয়েছিল, তারপর ম্যাগগকে ওদের খোঁজে পাঠিয়ে দিলাম।

দেখা গেছে, ঘন জঙ্গলে কুকুরের তাড়া খেলে ময়ূর সর্বদাই কোন গাছের উপর উঠে বসে। শিকারী হিসেবে তখন গাছে-বসা পাখি মারা পর্যন্ত আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন; তাই ম্যাগগ আর আমি দু-জনে অনেক চেষ্টায় একটু শিকার করলাম। শিকারের মধ্যে ময়ূর হল ম্যাগগের সবচেয়ে প্রিয়, তাই যখন কোন ময়ূর তাড়া খেয়ে গাছে উঠে পড়ত, গাছের নিচে গিয়ে তাদের দিকে মুখ করে খুব ঘেউ-ঘেউ করত সে, আর যখন তারা তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত সেই সুযোগ আমি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আমার কাজ সারতাম।

ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে গিয়ে ময়ূর সাতটা নিশ্চয় দৌড়ে থাকবে; কারণ ম্যাগগ ঝোপের মধ্যে অন্তত শ-খানেক গজ যাবার পর আমি ডানার ঝাপটানি আর ময়ূরের চিৎকার শুনতে পেলাম, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাগগের চিৎকার আর একটা ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন কানে এল। বোঝা গেল ময়ূরটা ম্যাগগকে নিয়ে একটা ঘুমন্ত বাঘের কাছে গিয়ে পড়েছে, আর পাখি আর কুকুর আর বাঘ সকলেই যে যার মত করে বিস্ময়, আতঙ্ক আর বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ভয়েব ভাবটা কাটিয়ে উঠে এখন ম্যাগগ ভীষণ চিৎকার আর ছুটোছুটি করতে লাগল, আর বাঘটা গর্জনের পর গর্জন করে তাকে তাড়া করল আর দুটিই আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এই হৈ-হল্লার মধ্যে একটা ময়ূর কোথা থেকে ভেসে এসে ভয়ের সঙ্কেত ধ্বনি করে বসল ঠিক আমার মাথার উপরের একটা গাছের ডালে। অবশ্য সেই মুহূর্তে আর আমার পাখির উপর কোন আকর্ষণ ছিল না—একমাত্র চেষ্টা আমার তখন, এমন কোথাও যেতে হবে যেখানে বাঘ নেই। ম্যাগগের তো চারটে পা আছে, কিন্তু আমার মোটে দুটো: তাই কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুকে ফেলে রেখেই আমি প্রচণ্ড দৌড় লাগালাম। জীবনে আর কখনো আমি অমন দৌড় দৌড়েছি কি না সন্দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাগগ আমাকে ধরে ফেলল, এবং বাঘের গর্জন আর পেছন থেকে শোনা গেল না।

এখন আমি কল্পনা করছি (এ-কল্পনা করা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না) যে বাঘটা ফাঁকা জায়গাটায় এসে তার থাবার উপর ভর করে বসে বাঘের হাসি হেসেছে। এই ভেবে সে হেসেছে যে, একটা মস্ত কুকুর আর একটা ছোট্ট ছেলে যাকে দেখে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো, আসলে সে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে বলে তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল মাত্র।

কালাঢুঙ্গি ছেড়ে আমাদের গ্রীষ্মাবাস নৈনিতাল যাবার আগে সেই শীতকালে আমাকে আর একটা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এবার আমি একা, কারণ

ম্যাগগ তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে গেছে। ঘন জঙ্গল এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকার উপর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। নয়া গাঁওয়ের নিচে গারুপ্পুর রাস্তায় আমি বন-মোরগের সন্ধানে চলেছি। রাস্তার উপর অনেক পাখি দেখা গেল, কিন্তু তাদের কোনটাই গুলির পাল্লার মধ্যে যেতে দিল না। বাধ্য হয়ে তখন আমি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। এ জঙ্গলে কিছু বড় বড় গাছ, আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু ঝোপ ও ছোট ছোট ঘাস। জঙ্গলে ঢোকবার আগে আমি জুতো-মোজা খুলে ফেললাম। সামান্য একটু এগোতেই দেখলাম, একটা লাল বনমোরগ পা দিয়ে দিয়ে একটা গাছের নিচে শুকনো পাতা আঁচড়াচ্ছে।

বনমোরগ কিংবা পোষা মোরগছানা যখন শুকনো পাতা বা আবর্জনার গাদা আঁচড়ায়, প্রথমটা সে মাথা তুলে দেখে নেয় কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। তারপর মাথা নামিয়ে কোন লুকোনো-পোকা-মাকড় বা শস্য খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। এই মোরগটা যে গাছটার নিচে খেতে ব্যস্ত ছিল সে জায়গাটা আমার বন্দুকের পাল্লার বাইরে। তাই আমি খালি পায়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হলাম। যখনই পাখিটা মাথা নামাচ্ছে সেই সুযোগে কয়েক গজ অগ্রসর হচ্ছি, আর নিশ্চল হয়ে থাকছি যখনই সে মাথা তুলছে—এইভাবে অগ্রসর হতে হতে আমি একটা নিচু জায়গায় এসে তাকে প্রায় পাল্লার মধ্যে এনে ফেললাম। নিচু জায়গাটার দু-দিকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা লম্বা ঘাস, একটা পা সেই নিচু জায়গাটার উপর আর দুটো পা বাইরের দিকে ফেললেই আমি তাকে নাগালের মধ্যে পাব, আর সেইসঙ্গে একটা ছোট গাছও পাব যার উপর ভারি বন্দুকটা রেখে ভাল করে তাক করতে পারব। গেলাম নিচু জায়গাটায়। কিন্তু পা ফেলতেই আমার পা পড়ল একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপের কুণ্ডলীর মধ্যে। ক-দিন আগে আমি যে দৌড় দৌড়েছিলাম কোন বালক কখনো তেমন দৌড়েছে কি না সন্দেহ, আর এই মুহূর্তে যে লাফ আমি লাফালাম কোন বালক কখনো তেমন লাফিয়েছে কি না তাও সন্দেহ। একেবারে গিয়ে পড়লাম নিচু জায়গাটার অপর পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে সেই কুণ্ডলীতে গুলি করেই ছুটতে শুরু করলাম—থামলাম না যতক্ষণ না রাস্তায় পৌঁছে নিরাপদ বোধ করলাম।

উত্তর ভারতের বন-জঙ্গলে বছরের পর বছর অনেক ঘোরা-ফেরা করেছি, কিন্তু কখনো শুনিনি কোন ময়াল সাপ কখনো মানুষ মেরেছে। কিন্তু তাহলেও বলব যে নিতান্ত ভাগ্যবলে আমি বেঁচে গেছি, কারণ যদি ময়ালটা আমার পা জড়িয়ে ধরতে পারত—এবং তা ধরতও, যদি ও তখন ঘুমিয়ে না থাকত—তাহলে আর ওকে কষ্ট করে আমায় মারতে হত না, কারণ ভয়েই আমি মারা পড়তাম, কদিন

কাগে যেমন একটা পূর্ণবয়স্ক হরিণের ল্যাজ একটা ময়ালের পাকে আটকা পড়ায় সে ভয়ে মারা পড়েছিল। ময়ালটা কত বড়, বা আমার গুলিতে সে মরেছে কি না তা আমি জানি না, কারণ তা দেখতে আমি ফিরে যাই নি। তবে ঐ অঞ্চলে আমি আঠারো ফুট লম্বা ময়াল পর্যন্ত দেখেছি, আর একবার দুটো ময়াল দেখেছি যাদের একটা একটা চিতল হরিণকে, আর অন্যটা একটা গরুকে আস্ত গিলে ফেলেছিল।

নৈনিতাল থেকে কালা ঢুঙ্গিতে ফেরার অল্প পরেই ম্যাগগের আর আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়। নৈনিতালের চারদিকের জঙ্গলে সেই সময় প্রচুর কালিজ ছিল, এবং শিকারী সংখ্যায় বিশেষ না থাকায় এবং তাদের মারার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ না থাকায় স্কুলের ছুটির পর আমি ম্যাগগকে নিয়ে বাড়িতে রান্নার জন্যে গোটা-দুই করে কালিজ বা পাহাড়ি তিতির শিকার করে আনতাম।

একদিন বিকেলে ম্যাগগকে নিয়ে আমি কালাঢুঙ্গি রোড দিয়ে চলেছি। অনেকগুলো কালিজকে ম্যাগগ তাড়া করে গাছে তুলল, কিন্তু কোনটাই এতক্ষণ গাছে রইল না যাতে আমি ভাল করে টিপ করে গুলি ছুড়তে পারি। উপত্যকার নিচে সত্যটাল বলে যে ছোট হ্রদটা ছিল সেখানে পৌঁছে আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম—আমাদের উদ্দেশ্য হল উপত্যকার উপরদিকের শেষ প্রান্তের গিরিখাত পর্যন্ত হেঁটে ফিরে যাব। হ্রদটার কাছে আমি একটা কালিজকে গুলি করলাম। তারপর ঘন ঝোপ আর বিরাট বিরাট পাথরের স্তূপের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে যখন আবার রাস্তাটার দুশো গজের মধ্যে এসে পৌঁছলাম তখন আমরা ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটা ঘাসে ভরা জায়গায় এসে পড়েছি। দেখলাম দোপাটি-ঝোপের তলা থেকে অনেকগুলো কালিজ লাফিয়ে উঠে একটা নিচু কুল-ঝোপের উপরে কুল খেতে শুরু করল। তাদের দেখা যাচ্ছিল কেবলমাত্র যখন তারা ফাঁকায় উঠে পড়েছিল সেই সময়। কোন চলন্ত প্রাণীকে গুলি করার মত হাত তখন আমার হয় নি, তাই আমি মাটিতে বসে পড়লাম আর ম্যাগগ আমার পাশে শুয়ে রইল,—প্রতীক্ষায় রইলাম কখন কোন পাখি ফাঁকা জায়গাটায় এসে বসবে।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা এইভাবে রয়েছি আর পাখিগুলো কুল খাবার জন্যে তখনো লাফালাফি করে চলেছে, এমন সময় পাহাড়ের উপর দিকে যে রাস্তাটা কোনাকুনিভাবে চলে গেছে সেই রাস্তা থেকে অনেক মানুষের চলার আর কথার আওয়াজ শোনা গেল। তাদের টিনের পাত্রের শব্দ থেকে বুঝলাম যে

তারা গোয়ালা; সারিয়া টালের নিচে তাদের বাড়ি থেকে নৈনিতালে দুধ বিক্রি করে এখন ফিরছে। প্রথমে তাদের চারশো গজ দূরের মোড়টায় বাঁক নেবার শব্দ আমার কানে এল, আর তারপর তারা আমার উপরের দিকে আর-একটু বাঁ দিকে একটা জায়গায় পৌঁছে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, যেন কোন প্রাণীকে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। পরমুহূর্তেই আমাদের ঠিক উপরের জঙ্গল থেকে একটা বড় জন্তুর এগিয়ে আসার শব্দ আমাদের কানে এল—জন্তুটা আসছে আমাদের দিকে। ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল না সেটা কী, দেখলাম—যখন সেটা দোপাটি গাছগুলোর কাছে ছিটকে এসে কালিজগুলোকে উড়িয়ে দিল। আমাদের মাথার উপর দিয়ে সবেগে উড়ে গেল সেগুলো। তার পরেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ ফাঁকা জায়গাটার উপর লাফিয়ে পড়ল। মাটিতে পড়াব আগেই চিতাবাঘটা আমাদের দেখতে পেয়েছিল; মাটিতে লেপটে পড়ে সে সেইভাবেই রয়ে গেল নিস্পন্দ। ফাঁকা জায়গাটা ত্রিশ ডিগ্রি কোণ করে একটু একটু করে উঠে গেছে; আমাদের থেকে উপরে, এবং মাত্র দশ গজ দূরে থাকায় তার সমস্ত শরীরটা দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। তাকে দেখে আমি আমার বাঁ হাতটা বন্দুক থেকে সরিয়ে ম্যাগগের কাঁধের উপর রাখলাম,—টের পেলাম, আমার নিজের শরীরের মত ওর শরীরেও কাঁপন দেখা দিয়েছে।

এই প্রথম ম্যাগগ আর আমি চিতাবাঘ দেখলাম। বাতাস বইছিল নিচের থেকে পাহাড়ের উপর দিকে; তার আর আমার মধ্যে যেন একই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—তা হল প্রচুর উত্তেজনা, কিন্তু ভয় মোটেই নয়। ভয় না পাবার কারণ আমি আজ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার পরে বুঝতে পারি—তা হল, চিতাবাঘটার আমাদের উপর কোন জিঘাংসা ছিল না। রাস্তা থেকে মানুষের তাড়া খেয়ে হয়ত সে সেই পাথরগুলোর দিকে চলে যাচ্ছিল যেখান থেকে ম্যাগগ আর আমি এইমাত্র এসেছি; তাই ঝোপটা ডিঙিয়ে একটা ছোট ছেলে আর একটা কুকুরের দেখা পেয়ে সে অবস্থাটা বোঝবার জন্যে স্থির হয়ে ছিল। আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছিল সে তার প্রতি কোন হিংসাত্মক মনোভাব আমাদের মধ্যে নেই। জঙ্গলের যে-কোন প্রাণীর চেয়ে পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে চিতাবাঘের সময় লাগে অল্প। তাই আমাদের থেকে ভয়ের কিছু নেই বুঝতে পেরে এবং আশে-পাশে আর কোন মানুষের সাড়া না পেয়ে সে সেই অবস্থায় লাফিয়ে উঠল আর কমনীয় ভঙ্গিতে আরো কয়েকটি লাফ দিয়ে পেছনের জঙ্গলে অন্তর্হিত হল। বাতাসে চিতাবাঘটার গন্ধ আসতেই মুহূর্তের

মধ্যে ম্যাগগ খাড়া হয়ে উঠল আর খুব গর্জন শুরু করে দিল, তার ঘাড়ের আর পিঠের সমস্ত লোম সিধে হয়ে উঠল; কারণ এতক্ষণে সে বুঝল, যে সুদর্শন প্রকাণ্ড জন্তুটাকে চোখে দেখে সে একটুও ভয় পায় নি এবং যে খুব সহজেই তাকে মেরে ফেলতে পারত সে হল চিতাবাঘ, জঙ্গলের সকল জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক শত্রু তার।

৪

গুলতি আর গাদা-বন্দুক—আমার শিকারী জীবনের এই দুই অধ্যায়ের মাঝে ছিল এক তীর-ধনুকের অধ্যায়। সে সময়ের কথা মনে করে আজও আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে; কারণ তীর-ধনুকে কখনো কোনো পাখি বা পশু বধ করতে না পারলেও, প্রকৃতির ব্যাঙ্কে সেই সময়েই প্রথম আমার যৎসামান্য সঞ্চয় হয়েছিল এবং মধ্যবর্তী ও পরবর্তী জীবনে জঙ্গল-গাথার যে নিবিড় পরিচয় আমার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল আজও তা আমার কাছে অশেষ আনন্দের উৎস হয়ে রয়েছে।

'শিখেছি' কথাটার চেয়ে 'আত্মস্থ করেছি' কথাটা আমার বেশি পছন্দ, কারণ জঙ্গল-গাথা তো কোন বিজ্ঞান নয় যে পাঠ্য কেতাব পড়ে শেখা যাবে, এ কেবল একটু একটু করে আত্মস্থ করার জিনিস; কারণ প্রকৃতি-গ্রন্থের না আছে কোন শুরু, না আছে কোন শেষ। সে বই যেখানে খুশি এবং যে-কোন বয়সে খুলে পাঠ করা সম্ভব, এবং জ্ঞান লাভের বাসনা যদি থাকে এ বই তাহলে অসীম কৌতূহল জাগাবে এবং যত নিবিড়ভাবেই আর যত দিন ধরেই পড়া যাক, এর আকর্ষণ কোনদিন হ্রাস পাবে না। কারণ প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

এখন বসন্তকাল। সামনের গাছটা ফুলের হাসি হেসে উঠেছে। রঙ-বেরঙের পাখি এই ফুলের আকর্ষণে এসে কেউ ডালে ডালে নাচছে, কেউ ফুল থেকে মধু খাচ্ছে, কেউ বা খাচ্ছে ফুলের পাপড়ি; কেউ বা আবার যেসব মৌমাছি মধু সংগ্রহে ব্যস্ত তাদের খেয়ে চলেছে। কাল এই ফুল ফলে পরিণত হবে। তখন আবার ভিন্ন ধরনের পাখিরা এসে গাছটা দখল করবে। এই ভিন্ন ধরনের পাখির আবার প্রকৃতির ব্যবস্থায় ভিন্ন কাজ; কারুর কাজ হল প্রকৃতির উদ্যান-শোভা বৃদ্ধি করা, কারুর বা প্রকৃতিকে সুরে ভরে তোলা, কারুর বা আবার তাকে গাছে-পালায় পুনরুজ্জীবিত করা।

বছরের পর বছর হয় ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্তন, সেইসঙ্গে দৃশ্যপটও বদলাতে

থাকে। পাখিদের নতুন ঝাঁক বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন জাতিতে এসে গাছের শোভা বৃদ্ধি করে। গাছের একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ে ঝড়ের বেগে। মরে যায় গাছটা। তখন আর-একটা গাছ এসে তার স্থান গ্রহণ করে। এইভাবে চলে আবর্তন-চক্র।

আপনার পায়ের কাছে যে পথটা, একটা সাপের চলা-পথ সেটা। সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে সাপটা সেই পথে চলে গেছে। সাপটা গিয়েছিল পথের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, তার শরীরের বেড় তিন ইঞ্চি; এবং সে যে বিষাক্ত সাপ তা একরকম নিশ্চয় করেই বলা চলে। অথচ কালই হয়ত এখানে অথবা অন্য কোন পথে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে পাঁচ মিনিট আগে যে সাপটা এ রাস্তা পার হয়েছিল সে গিয়েছিল বাঁ দিক থেকে ডান দিকে; তার শরীরের বেড় পাঁচ ইঞ্চি; এবং সে নির্বিষ।

আজ আপনি বনের রহস্য যেটুকু আত্মস্থ করলেন, আগামী কাল আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তা তার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং আপনার আত্মস্থ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে কতটা আপনি শিখলেন। এই শেখার সময়টা মোটামুটি কেটে যাবার পর—সে এক বছর পরে বা পঞ্চাশ বছর পরে যখনই হোক—তখনও দেখবেন যে আপনার শিক্ষাগ্রহণ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, প্রকৃতির সমস্ত রহস্য আপনার সামনে পড়ে রয়েছে। একটা কথা নিশ্চয় করে জানবেন যে, শেখবার যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে আপনি প্রকৃতি থেকে কিছুতেই কিছু শিখতে পারবেন না।

একটা তাঁবু থেকে আর একটা তাঁবু পর্যন্ত বারো মাইল পথ আমি এক অপূর্ব জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। তখন এপ্রিল মাস, প্রকৃতি সৌন্দর্যের শীর্ষে। সমস্ত গাছ সমস্ত ঝোপ সমস্ত লতা ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। রঙবাহার প্রজাপতির দল ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসও ফুলের গন্ধে ভরে উঠে পাখির ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। দিনের শেষে আমার সঙ্গীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম এ পথ-চলা তার ভাল লেগেছে কি না, সে বললে, 'উঁহু, রাস্তাটা বেজায় এবড়ো খেবড়ো!'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে একবার আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া জাহাজ 'কারাগোলা'য় করে বোম্বে থেকে মোম্বাসায় চলেছি। উপরের ডেকে ছিলাম আমরা পাঁচজন। আমি যাচ্ছি টাঙ্গানাইকায় একটা বাড়ি তৈরি করতে, আর বাকি চারজন চলেছে কিনিয়ায়—তিনজন যাচ্ছে শিকার করতে, আর একজন, যে গোলাবাড়িটা সে কিনেছে তার তদারক করতে। সমুদ্র ছিল অশান্ত, আর আমি নাবিক হিসেবে মোটেই ভাল নই। আমার বেশির ভাগ সময়ই তাই কেটেছে

ধূমপানের কক্ষে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। আর এরা কাছেই একটা টেবিলে বসে তাস খেলতে খেলতে ধূমপান করেছে আর গল্প-গুজব করেছে,—সে গল্প বেশির ভাগই শিকারের গল্প।

একদিন পায়ে টান ধরায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। ওদের কথাবার্তা আমার কানে এল। শুনলাম সবচেয়ে যে অল্পবয়স্ক সে বলছে, 'ওঃ বাঘ সম্বন্ধে আমার আর জানতে কিছু বাকি নেই। গত বছর আমি মধ্যপ্রদেশে এক ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে পনেরো দিন ছিলাম।'

দুটোই দুই তরফের চূড়ান্ত উদাহরণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হলেও এ থেকে আমার যা বক্তব্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমি এই বলতে চাই যে যদি আপনার কৌতূহল না থাকে তাহলে যেমন যে পথ ধরে চলেছেন তা ছাড়া আর কিছুই আপনার চোখে পড়বে না, তেমনি যদি আপনার শেখবার কোন আগ্রহ না থাকে আর মনে করে থাকেন যে যা আসলে সারা জীবন ধরেও শেখা যায় না আপনি তা পনের দিনে শিখতে পেরেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহলে আপনি যে অজ্ঞ সেই অজ্ঞই থেকে যাবেন।

৫

আমার ছেলেবেলায় স্কুল-জীবনের দশটি বছরে আর তার পর যখন আমি বাংলা দেশে ছিলাম তখন—এই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে আমার সমস্ত ছুটি কাটত কালাঢুঙ্গি আর তার আশেপাশের জঙ্গলে। যদি আমি সেই সুযোগে জঙ্গলকে যথাসম্ভব আত্মস্থ করতে না পেরে থাকি, তবে সে দোষ আমার নিজের, কারণ তার প্রচুর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। এমন সুযোগ ভবিষ্যতে আর কারুর মিলবে না, কারণ জনতার চাপে এমন অনেক অঞ্চলে এখন চাষবাস শুরু হয়েছে যেখানে আমার সময়ে বন্য প্রাণীরা ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা করত। জঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে যে-সব অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী তার মধ্যে একটা হল সেইসব গাছ কেটে ফেলা যার ফল আর ফুল পশুপাখিদের খাদ্য। গাছগুলো কাটার ফলে লক্ষ লক্ষ বানর বন ছেড়ে চাষের ক্ষেতে গিয়ে পড়ল এবং এর ফলে যে সমস্যা দেখা দিল, ভারতীয়দের ধর্মীয় সংস্কারের জন্যে তার প্রতিকার করা গভর্মেণ্টের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। এমন দিন আসবে যখন এইসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, এবং সে দায়িত্ব যাদের উপর পড়বে কাজ তাদের মোটেই সহজ হবে না, কারণ কেবলমাত্র যুক্তপ্রদেশেই বানরের সংখ্যা আমার মনে হয় এক কোটির কম নয়। এক কোটি

বানরের শস্য-ক্ষেতের ও ফলের উপর জীবন ধারণ করতে হলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, অপরিসীম তার গুরুত্ব।

সেই সুদূর অতীতে যদি আমি ধারণা করতে পারতাম যে একদিন আমাকে এই বইটা লিখতে হবে, তাহলে চেষ্টা করতাম যা শিখেছি তা তার চেয়ে ভাল করে শিখতে, কারণ যে অবিমিশ্র আনন্দ আমি জঙ্গলের মধ্যে পেয়েছি আনন্দের সঙ্গেই আমি তা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতাম। আমার এ আনন্দের কারণ হয়ত এই যে, যে-কোন বন্য প্রাণীই তার স্বাভাবিক পরিবেশে সুখী। প্রকৃতির বুকে কোন দুঃখ, কোন অনুশোচনা নেই। যখন কোন ঝাঁক থেকে কোন পাখি বা পাল থেকে কোন জন্তু বাজপাখি বা কোন মাংসাশী জন্তুর কবলিত হয়, বাকিরা তখন আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে তাদের সময় তখনও আসে নি, এবং ভবিষ্যতের চিন্তা তাদের বিশেষ ব্যাকুল করে না। যখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম ছিল, আমি পাখিদের আর ছোট ছোট জন্তুদের বাজপাখির বা ঈগলের বা মাংসাশী জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একটি প্রাণীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি আসলে দুটি প্রাণীর জীবন নাশের কারণ হয়ে পড়েছি। এর কারণ, বাজপাখি বা ঈগলের নখে আর মাংসাশী প্রাণীর থাবায় পচা মাংস বা রক্ত জেগে যে বিষের সৃষ্টি হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চিকিৎসা না পেলে (এবং জঙ্গলে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়) তাদের কবল থেকে উদ্ধার-করা জীব শতকরা একটির বেশি বাঁচতে পারে না, এবং হন্তা তার শিকারকে হারিয়ে ক্ষুধার তাড়নে বা শাবকের প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি প্রাণীকে বধ করতে বাধ্য হয়।

কয়েক জাতের পাখির কাজ হল প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা। এই কাজ করতে আর সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্যে তাদের পক্ষে হত্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডও প্রচুর নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং যথা-সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। হন্তার তরফ থেকে হত্যাকাণ্ড তাড়াতাড়ি করা দরকার, কারণ নতুবা শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। জীবের যন্ত্রণার যাতে তাড়াতাড়ি অবসান হয় প্রকৃতির বিধান তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।

প্রত্যেক প্রাণীর নিজস্ব হত্যা-পদ্ধতি আছে এবং বহুলাংশেই তা নির্ভর করে শিকারী ও তার শিকারের পারস্পরিক আকৃতির উপর। যেমন ধরুন, যে যাযাবর বাজপাখি সাধারণত মাটিতে শিকার করে, সে দরকার পড়লে কোন উড়ন্ত ছোট পাখিকে উড়তে উড়তেই ধরে খেয়ে ফেলে। তেমনি,কোন বাঘ যদি কোন বিশেষ অবস্থায় শিকারকে কাবু করবার আগে তার পায়ের শিরা কেটে ফেলা

দরকার মনে করে, অবস্থান্তরে হয়ত আবার তাকে এক আঘাতে হত্যা করবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় বনের প্রাণী বিনা কারণে হত্যা করে না। খেলাচ্ছলে হত্যা করা যে একেবারে হয় না তা অবশ্য নয়, এবং, কোন কোন প্রাণী, বিশেষ করে গন্ধগোকুল বা নেউল যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হত্যা করে না তাও নয়। শিকার কথাটার অর্থ ব্যাপক, এর ব্যাপক অর্থই করতে হবে।

পেরি উইণ্ডহাম যখন কুমায়ুনের কমিশনার ছিলেন তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল স্যর হারকোর্ট বাটলার তাঁকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ চিড়িয়াখানার জন্যে একটা ময়াল সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ যখন আসে উইণ্ডহাম তখন তাঁর শীতকালীন টুরে ছিলেন। কালাঢুঙ্গিতে তিনি এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কমিশনারের তরফ থেকে রাজ্যপালকে উপহার দেওয়া যেতে পারে এমন কোন ময়ালের সন্ধান আমার জানা আছে কি না। এখন, এমনই একটা ময়ালের খবর আমার জানা ছিল; পরদিন তাই উইণ্ডহাম, তাঁর দুই শিকারী আর আমি হাতির পিঠে চড়ে সেই ময়ালের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এই ময়াল আমার বহু বছরের চেনা, তাই পথ চিনে হাতিকে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হল না।

গিয়ে দেখি ময়ালটা সটান হয়ে একটা ছোট ঝরনার উপর শুয়ে রয়েছে। টলটলে জল এক কি দু-ইঞ্চি তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ঠিক যেন কোন চিড়িয়াখানার কাঁচের ঘরে তাঁকে দেখছি। উইণ্ডহাম দেখে বললেন ঠিক এমনটিই তিনি চাইছিলেন; মাহুতকে তিনি হুকুম করলেন একটা লম্বা দড়ি জোগাড় করতে। দড়ি জোগাড় হলে উইণ্ডহাম তার এক দিকে একটা ফাঁস লাগালেন। তারপর সেটা শিকারীদের হাতে দিয়ে তাদের হুকুম করলেন সেই ফাঁসে আটকে সাপটাকে ধরে আনতে। আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওরা বললে এ কাজ একেবারেই অসম্ভব। শুনে উইণ্ডহাম বললেন ভয় নেই, যদি সাপটা আক্রমণের কোনরকম উদ্যোগ করে তখন তিনি গুলি করবেন—একটা ভারি রাইফেল তিনি সঙ্গে এনেছেন। কিন্তু এতেও যখন ওরা আশ্বস্ত হল না তখন তিনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যথেষ্ট জোরের সঙ্গে আমি আপত্তি জানাতে তিনি রাইফেলটা আমার হাতে দিলেন, তারপর নিজে নেমে গিয়ে শিকারীদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমার খুব আফশোস হল যে এর পরের কয়েক মিনিট ধরে যে

ব্যাপার ঘটল তা তুলে নেবার জন্যে রাইফেল না এনে মুভি ক্যামেরা আনি নি, কারণ অমন মজার ব্যাপার আমি আর কখনও দেখিনি। উইণ্ডহামের মতলব ছিল পাইথনটার ল্যাজে ফাঁসটা আটকে শুকনো ডাঙায় তুলে নেওয়া এবং তারপর সেটাকে এমনভাবে বেঁধে ফেলা যাতে হাতিতে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। শিকারী দু-জনকে মতলবটা বুঝিয়ে দিতে তারা তখন ফাঁসটা উইণ্ডহামের হাতে দিয়ে বললে যে, ফাঁসটা যদি তিনি সাপটার ল্যাজে আটকে দেন তাহলে তারা তাকে টেনে তুলবে। কিন্তু উইণ্ডহামের দৃঢ় ধারণা এই যে, এ কাজটা তাঁর চেয়ে শিকারীরাই পারবে ভাল। শেষ পর্যন্ত অনেকবার এগিয়ে যাওয়া আর পেছিয়ে আসা আর মুক অভিনয় করা হল যাতে পাইথনটা চমকে ওঠে; তারপর তিনজনেই জলে নেমে পড়ল। প্রত্যেকেরই চেষ্টা, ফাঁসটা থেকে যতটা দূরে সম্ভব দড়ি ধরে কোনরকমে কাজটা সারা। এভাবে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা নদীর উজান বেয়ে এগোল। যখন তারা নাগালের মধ্যে এসে পৌঁছেছে আর প্রত্যেকেই চাইছে অন্য কেউ ফাঁসটা ল্যাজে লাগাক, এমন সময় পাইথনটা তার মাথাটা জল থেকে এক ফুট কি দু-ফুট উপরে তুলল আর তাদের দিকে এগোবার উপক্রম করল। সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটোতে ছিটোতে দৌড়ে পালাতে লাগল শিকারী দু-জন আর চেঁচাতে লাগল,— 'ভাগো সাহেব!' উইণ্ডহামও তাদের পিছু-পিছু ছুটতে শুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে তিন জনে তীরের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে সবেগে ঢুকে পড়ল, আর পাইথনটা একটা বড় জাম গাছের শেকড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মাহুতের আর আমার হাসতে হাসতে প্রায় হাতির পিঠ থেকে পড়ে যাবার অবস্থা!

এর এক মাস পরে একদিন আমি উইণ্ডহামের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন পরদিন তিনি কালাঢুঙ্গিতে আসবেন, আর-একবার চেষ্টা করবেন পাইথনটাকে ধরতে। জিঅফ্ হপকিন্স আর তাঁর এক বন্ধু সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন, চিঠিটা যখন আসে তাঁরা তখন আমার সঙ্গে ছিলেন। বেরিয়ে পড়লাম তিন জনে দেখতে পাইথনটাকে যেখানে দেখেছিলাম সেখানে সে আছে কি না। যে গাছটার শেকড়ের নিচে পাইথনটা থাকত, তার কাছে ছিল সম্বরদের একটা আড্ডা। যুগ যুগ ধরে সম্বরের পায়ের খুরে খুরে এখানকার মাটি সূক্ষ্ম ধুলোয় পরিণত হয়েছিল। দেখলাম পাইথনটা সেখানে মরে পড়ে আছে, কয়েক মিনিট আগে একজোড়া উদ্‌বিড়াল ওকে হত্যা করেছে। উদ্‌বিড়ালরা নিছক শিকারের আনন্দেই পাইথন আর কুমির মেরে থাকে, কারণ কখনো আমি

তাদের পাইথন বা কুমির খেতে দেখিনি। পাইথন আর কুমির ওরা মেরে থাকে এইভাবে। পাইথন বা কুমির যখন ডানদিকের উদ্‌বিড়ালটার আক্রমণ এড়াবার জন্যে মাথা ফেরায়, বাঁ দিকের উদ্‌বিড়ালটা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে (উদ্‌বিড়ালরা অত্যন্ত চটপটে) তাদের শিকারের কাঁধে কামড় বসায়,—তার মাথার যতটা কাছে সম্ভব। তারপর যখন সে বাঁয়ের আততায়ীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত, ডান দিকেরটা তখন লাফিয়ে এসে একটা কামড় বসায়। এইভাবে এ একবার ও একবার একটু একটু করে মাংস খুবলে নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত যখন হাড় পর্যন্ত সমস্ত মাংসটা উঠে যায় তখনই তারা মরে ; কারণ পাইথন বা কুমিরের জীবনী শক্তি অত্যন্ত বেশি।

পাইথনটা লম্বায় ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি, আর তার বেড় ২৬ ইঞ্চি। সুতরাং তাকে মারতে গিয়ে উদ্‌বিড়ালদুটোকে প্রচুর ঝুঁকি নিতে হয়েছে। তবে, উদ্‌বিড়ালরা খুব দুঃসাহসী ; মানুষের মত তারাও, যে শিকারে বিপদের সম্ভাবনা যত সেই শিকারকেই তত পছন্দ করে থাকে।

দ্বিতীয় উদাহরণটা হল একটা বড় পুরুষ হাতি আর একজোড়া বাঘের সঙ্ঘর্ষ। 'শিকারের আনন্দে শিকার'—আমার এ ধারণাটা মেনে না নিলে, ভারতের জঙ্গলের লাট সাহেবের সঙ্গে বনের রাজার আর রানীর এই সঙ্ঘর্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখাতে পারব না। এই লড়াইয়ের প্রচুর প্রচার তখন হয়েছিল এবং বিখ্যাত শিকারীরা 'পাইওনীয়ার' আর 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে এ নিয়ে অনেক চিঠি লিখেছিল। এই লড়াইয়ের কারণ হিসেবে দেখানো হয় : পুরোনো আক্রোশ ; বাচ্চা মারার জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ, আর খাবার জন্যে আক্রমণ। এইসব লেখক কেউই সে লড়াই প্রত্যক্ষ করে নি, এবং তার ফলে এই ধরনের অন্যান্য কয়েক ক্ষেত্রের মত এ-ক্ষেত্রেও ধারণাগুলো ধারণাই রয়ে গেছে, কিছুই প্রমাণিত হয় নি।

হাতি আর দুই বাঘের লড়াইয়ের কথা আমি প্রথম শুনি যখন তরাই আর ভাবরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমায় জিজ্ঞাসা করলেন একটা হাতিকে পোড়াতে ২০০ গ্যালন মোম দরকার হবে কি না। নৈনিতালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অফিসে খোঁজ করে জানা গেল যে হাতিটা দুটো বাঘের হাতে তানাকপুরের এক পাথুরে এলাকায় মারা পড়েছে, সেখানে তাকে কবর দেওয়া সম্ভব নয় বলেই পোড়াবার খরচ দাবি করা হয়েছে। খবরটা আমার কাছে প্রচুর চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘটনাটা দশ দিনের পুরোনো, এবং তার যা চিহ্ন সব পুড়ে গিয়েছিল আর প্রবল বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গিয়েছিল।

তানাকপুরের নায়েব তশিলদার ছিল আমার বন্ধু। এ লড়াই না দেখলেও

এর বৃত্তান্ত সে শুনেছিল। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তার কাছে শুনেছি বলেই আমি বর্ণনা করতে পারছি।

সাউথ-ত্রিহুত্ রেলওয়ের একটা শাখার শেষ স্টেশন তানাকপুরের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রচুর গুরুত্ব। সারদা নদী যেখানে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে তার ডানদিকে এর অবস্থিতি। যে উঁচু জমিতে তানাকপুর অবস্থিত ত্রিশ বছর আগে এই নদী সেখান দিয়ে বইত, কিন্তু সমস্ত বড় নদীর মতই সারদাও যেখানে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে সেখানে ছোট-ছোট শাখার সৃষ্টি করেছে, এবং যে সময়ের কথা বলছি তখন নদী তানাকপুর থেকে দু-মাইল দূরে চলে গেছে, নদীর প্রধান তীর (যেটা প্রায় একশো ফুট উঁচু) আর আসল নদীটার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকগুলো ছোট-ছোট শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এইসব শাখার মধ্যে মধ্যে যে সব দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোয় কোথাও মাঝারি আকারের, কোথাও বা ঘন গাছপালা, ঝোপঝাড় বা ঘাসের জঙ্গল রয়েছে।

তানাকপুরের দু-জন মাল্লা একদিন সরদা নদীতে মাছ ধরতে যায়। যখন তারা ফিরবে ঠিক করেছিল তখন হয়ে উঠল না,—গ্রামের দু-মাইল পথ যখন তারা ধরল তখন সূর্য অস্তগামী। শেষ শাখানদীটায় পৌঁছে একটা খুব ঘন ঘাস জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তারা দেখে, দুটো বাঘ শাখানদীটার অপর পারে দাঁড়িয়ে আছে। শাখানদী এখানে চল্লিশ গজ মত চওড়া, জল যৎসামান্যই। যে পথে তাদের যেতে হবে বাঘদুটো সেখানে রয়েছে দেখে তারা যেখানে ছিল সেইখানেই গুঁড়ি-গুঁড়ি দিয়ে বসে অপেক্ষায় রইল যতক্ষণ না বাঘদুটো চলে যায়। বাঘ ওরা অনেকবার দেখেছে, তাই অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে উঠল না। এ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, কারণ ভয়-পাওয়া মানুষ কল্পনার ঘোরে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখে ফেলে। তখনও অস্ত-সূর্যের কিছু আলো রয়ে গেছে, আর পূর্ণ চন্দ্রও এইমাত্র মানুষ দু-জন আর বাঘদুটোর পেছনে উঠে ঢাকা জায়গাটা আলোকিত করে তুলল। যে ঘাসের জঙ্গল ভেঙে তারা এসেছিল হঠাৎ সেখানে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড হাতি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে,—বিরাট তার দাঁতদুটো। তানাকপুরের জঙ্গলে এই দাঁতাল হাতিটা সুপরিচিত, তার একটা বদ অভ্যাস হল চেন-এর বন-বাংলোটা যে-সব খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো ভেঙে ফেলা, এবং এইজন্যে সবাই তার উপর বিরক্ত। অবশ্য মানুষ সে মারে নি, সুতরাং সে হিসেবে তাকে দুষ্ট হাতি বলা চলে না।

শাখা-নদীতে নেমে এসে হাতিটা বাঘদুটোকে দেখতে পেয়ে শুঁড়ে তুলে বৃংহিত-ধ্বনি করল আর সেদিকে অগ্রসর হল। তখন বাঘদুটো হাতির দিকে

ফিরল। হাতিটা এগিয়ে আসতে একটা বাঘ তার সামনে রয়ে গেল, আর অপরটা ঘুরে পেছন থেকে তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। মাথা ঘুরিয়ে হাতিটা তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরতে যেতেই তখন সামনের বাঘটা তার মাথার উপর লাফিয়ে পড়ল। হাতিটা ইতিমধ্যে ক্রোধে গর্জন করে উঠেছে, আর বাঘদুটোও গলা ছেড়ে প্রচণ্ড গর্জন শুরু করেছে। ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এখন আবার তার সঙ্গে হাতিটার চিৎকার মিশে যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হল তাতে ঘাবড়ে গিয়ে মাল্লা দু-জন জাল, মাছ সব ফেলে প্রাণপণে তানাকপুরের দিকে ছুটল।

এই লড়াইয়ের আওয়াজ প্রথম যখন তানাকপুরে পৌঁছয় গ্রামে তখন নৈশাহারের ব্যবস্থা হচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পরে যখন মাল্লা দু-জন একটা হাতি আর দুটো বাঘের এই লড়াইয়ের খবর নিয়ে পৌঁছল, কয়েকজন দুঃসাহসী উঁচু পাড়টার ধারে গেল সে-লড়াই দেখতে। কিন্তু যখন তারা বুঝল যে লড়িয়েরা লড়াই করতে করতে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল সবাই, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তানাকপুরের প্রত্যেকটি বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লড়াইটা কতক্ষণ চলেছিল এ নিয়ে সবাই একমত নয়। কারুর কারুর মতে এ লড়াই সারা রাত চলেছিল, আবার কারুর কারুর মত হল তা চলেছিল মধ্যরাত পর্যন্ত। অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক মিঃ ম্যাথেসনের বাংলো ছিল লড়াইটা যেখানে হচ্ছিল তার ঠিক উপরে; তিনি বলেন এ লড়াই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছিল এবং এমন ভয়ঙ্কর শব্দ তিনি জীবনে আর কখনো শোনেন নি। বন্দুকের আওয়াজ অবশ্য রাত্রে শোনা গিয়েছিল, কিন্তু তা মিঃ ম্যাথেসনের, না পুলিশের বন্দুকের আওয়াজ তা বোঝা যায় নি। যাই হোক তাতে কোন কাজ হয় নি—যুদ্ধও বন্ধ হয় নি, আর যুধ্যমানেরাও ওখান থেকে চলে যায় নি।

সকালবেলা আবার তানাকপুরের মানুষরা সেই উঁচু জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল। দেখল, একশো ফুট পাথরের নুড়ি-ছাওয়া জায়গাটার পাদদেশে হাতিটা মরে পড়ে রয়েছে। আঘাতের চিহ্ন সম্বন্ধে নায়েব-তশিলদারের বর্ণনা শুনে বুঝলাম, তার মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে। হাতিটার শরীরের কোন অংশ বাঘে খায় নি, আর কোন আহত বা হত বাঘেরও কোন চিহ্ন তখন বা পরবর্তীকালে তানাকপুর অঞ্চলে দেখা যায় নি।

আমার মনে হয় বাঘদুটোর ইচ্ছে ছিল না হাতিটাকে হত্যা করে। পুরোনো কোন ক্ষতির প্রতিশোধ, বা বাচ্চা মারার জন্যে আক্রোশ, বা খাবার জন্যে হত্যা করা,—কোন যুক্তিই জোরালো নয় যথেষ্ট। ব্যাপারটা কিন্তু যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে

এই : একটা বড় পুরুষ-হাতি, তার দুটো দাঁতের ওজন নব্বই পাউণ্ড, তানাকপুরের কাছাকাছি অঞ্চলে একজোড়া বাঘের হাতে মারা পড়ে।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঘটনাচক্রেই ঘটে গেছে। একটা বাঘ আর একটা বাঘিনীর মিলনের সময় একটা হাতি তার পথ থেকে তাদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল এবং সেই চেষ্টাই ক্রমশ সত্যিকারের লড়াইয়ে পরিণত হয়। মনে হয় দ্বিতীয় বাঘটা হাতিটার মাথায় লাফিয়ে পড়ে তার চোখদুটো থাবা মেরে উবড়ে ফেলেছিল, আর হাতিটা দৃষ্টি হারিয়ে এলোপাথাড়িভাবে বাঘদের তাড়া করতে করতে শেষ পর্যন্ত উঁচু তীর অবধি গিয়ে পৌঁছেছিল। এখানে আলগা পাথরগুলোর মধ্যে সে পা ঠিক রাখতে পারছিল না, যার ফলে সে বাঘদুটোর সম্পূর্ণ আওতার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। লড়াইয়ের সময় বাঘদুটো তার হাতে কিছু চোট খেয়েছিল, ফলে তারা অত্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছিল।

মাংসাশী প্রাণী মাত্রেই দাঁতের কামড়ে হত্যা করে থাকে, আর যে-সব প্রাণী তাদের শিকারের পিছু নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করে শিকার করে, শুধু শিকারকে ধরে রাখবার জন্যেই নয়, কখনো-কখনো দাঁত বসাবার আগে থাবা মেরে তাকে কাবু করেও থাকে। যে-সব প্রাণী শিকারকে আক্রমণ করে হত্যা করে তাদের কথা বাদ দিলে, হত্যা করার ব্যাপারটা জঙ্গলে এত কম প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ হলেও গোড়ার দিকের ব্যাপারগুলো তাড়াতাড়ি ঘটে যায় আর তা অনুসরণ করা এত কঠিন হয়ে ওঠে যে, বাঘ আর চিতাবাঘের প্রায় গোটা-কুড়ি হনন-কার্য লক্ষ্য করার পরও, ঠিক যে সময়ে আততায়ী শিকারের উপর গিয়ে পড়ে সে সময়কার ব্যাপারগুলোর নিখুঁত বর্ণনা করতে পারব না। যে-সব ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে মাত্র একবার আমি মুখোমুখি আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছি—আক্রমণটা হয়েছিল একটা চিতল হরিণীর উপর। এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা, বাঘ বা চিতাবাঘ যেসব প্রাণীকে আক্রমণ করে থাকে, তাদের পক্ষে তাকে শিং দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করা সম্ভব। এ ছাড়া আর যে-সব আক্রমণ আমি প্রত্যক্ষ করেছি প্রত্যেকটাই তা হয় পেছন থেকে, নয় তো এক পাশ থেকে এসেছে, হয় এক লাফে, কিংবা একটুখানি ছুটে শিকারকে থাবা দিয়ে ধরেই বিদ্যুৎ-গতিতে তাকে গলা ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে।

কোন প্রাণীকে ধরাশায়ী করার সময় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ পূর্ণাবয়ব সম্বর বা চিতলের এক পদাঘাতে বাঘ বা চিতাবাঘের পেট ফেঁসে যেতে পারে। তাই আঘাত এড়াবার জন্যে, আর শিকার যাতে পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারে সেজন্যে তার মাথাটা মাটিতে পেড়ে ফেলবার সময় মুচড়িয়ে

ফেলা হয়। এ অবস্থায় আর তখন শিকার লাথি ছুঁড়েও তার কিছুই করতে পারে না এবং উঠে দাঁড়ানো বা পাক খাওয়াও আর তখন তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তাহলেই তার ঘাড় ভেঙে যাবে। এমন দেখা যায় যে কোন ভারি জন্তু ভূপাতিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড় ভেঙে গেছে, আবার এমনটিও দেখা যায় যে আততায়ীর কুকুর-দাঁতের কামড়ে তার ঘাড় ভেঙে গেছে। এই দুই কারণেও যে-সব ক্ষেত্রে ঘাড় না ভাঙে সে-সব ক্ষেত্রে দম বন্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়।

বাঘ তার শিকারকে পেছনের পায়ের হ্যামস্ট্রিং নামক শিরা ছিন্ন করে হত্যা করেছে এ-হেন ঘটনা আমি অনেক দেখেছি, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে শিরা কেটে হত্যা করা হয়েছে—দাঁত, নয় থাবার সাহায্যে। কিন্তু চিতাবাঘকে কখনো তা করতে দেখি নি। এক বন্ধু একবার আমার কাছে তাঁর একটা গরুর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে আসেন। জায়গাটা হল সেমধর শৈলশিরা,—নৈনিতাল থেকে ছ-মাইল দূরে। তাঁর অনেক গরু। বাঘের আর চিতাবাঘের হনন-কার্য তিনি অনেক প্রত্যক্ষ করেছেন,—কিন্তু এই গরুটার ঘাড়ে কোন আঘাতের চিহ্ন না দেখে, আর যে-ভাবে তার মাংস ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তা দেখে তাঁর ধারণা যে কোন অজানা জন্তু এ হত্যাকাণ্ডের জন্যে আর একে অংশত খেয়ে ফেলার জন্যে দায়ী। তখনো বেলা বেশি হয় নি, ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই আমরা অকুস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গরুটা পূর্ণবয়স্ক, পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা দাবানল-পথে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টা হয় নি। হত্যার বিবরণ শুনে আমার মনে হয়েছিল কোন কালো হিমালয়-ভাল্লুকের কাণ্ড এটা। ভাল্লুকরা স্বভাবত মাংস খায় না, তবে, মাঝে মাঝে তারা হত্যা করে থাকে। আর বাঘ বা চিতাবাঘের মত হত্যা করার ব্যবস্থা তার শরীরে না থাকায় অত্যন্ত বেয়াড়াভাবে তাকে তা করতে হয়। অবশ্য এ গরুটা ভাল্লুকের হাতে নয়, বাঘের হাতে মারা পড়েছে, এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে মারা পড়েছে। প্রথমে হ্যামস্ট্রিং শিরা কেটেছে, তারপর পেট ফাটিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা করার পর বাঘটা থাবা মেরে চামড়া ছিঁড়ে পেছনের দিক থেকে খানিকটা খাবলে খেয়ে ফেলেছে। শক্ত মাটিতে তার চিহ্ন ধরে এগোনো সম্ভব হল না। তাই বাকি দিনটা আমার কাটল আশে-পাশের জঙ্গলে বাঘটার সন্ধানে, যদি গুলি করার একটা সুযোগ জুটে যায়। সূর্যাস্ত নাগাদ আমি ফিরে এলাম, তারপর মড়ির কাছেই একটা গাছের ডালে বসে কাটিয়ে দিলাম বাকি রাতটা। অর্থাৎ বাঘটা মড়িতে ফিরে এল না। এইরকম

আরও নটা মড়িতেও সে ফিরে আসে নি এমন নজির পাওয়া গেল। ছটা গরু আর তিনটে অল্পবয়স্ক মোষকে ঠিক এইভাবেই সে মেরেছে।

মানুষের চোখে দেখলে এভাবে হত্যা করাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হবে, কিন্তু বাঘটার তরফ থেকে এটাকে তা বলা যায় না। খাবার জন্যে তার হত্যা করা দরকার, এবং হত্যার পদ্ধতিটা নির্ভর করে তার শরীরের অবস্থার উপর। বাঘটার কুকুর-দাঁত ছিল না যার সাহায্যে হত্যা করবে, শিকার টেনে নিয়ে যাবারও সামর্থ্য তার ছিল না। আর শিকারের দেহ থেকে দাঁতের সাহায্য না নিয়ে থাবার সাহায্যে মাংস ছিড়ে নেওয়া থেকে এই প্রমাণ হচ্ছে যে, তার শরীরে কোন বিকার আছে এবং আমার স্থির ধারণা এই যে, কোন অসাবধানী শিকারীর লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারি গুলি তার নিচের চোয়ালের খানিকটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তে আমি আসি বাঘটার প্রথম শিকার লক্ষ্য করে,—সে যে আহত হয়েছিল, এবং সে আঘাত এখনও তাকে ক্লেশ দিচ্ছে, এ ধারণা আমার আরও বলবৎ হয় হত্যাকাণ্ডগুলির মধ্যে লম্বা সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করে, ও ক্রমেই যেভাবে তার খাওয়া কমে আসছিল তা প্রত্যক্ষ করে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আঘাতটা এসেছিল তার কোন শিকার থেকেই, এবং এই কারণেই সে দ্বিতীয়বার কোন মড়িতে ফিরে আসে নি। দশটা হত্যাকাণ্ডের পর তার প্রাণীহত্যা বন্ধ হয়, এবং ও অঞ্চলে যখন কোন বাঘ মারা হয় নি বা মৃত বাঘ পাওয়া যায় নি তখন আমার বিশ্বাস যে, কাছের পাহাড়ে যে সব অসংখ্য গুহা আছে গুঁড়ি মেরে তারই একটার মধ্যে গিয়ে সে আঘাত-জনিত ক্ষতে মারা পড়েছে।

এ হল অত্যন্ত অস্বাভাবিক পদ্ধতি সন্দেহ নেই। কিন্তু পায়ের শিরা কেটে হত্যা করার আরও নজির আমার আছে। খুব বড় বড় দুটো মোষকে আমি বাঘের কবলে ওভাবে মারা পড়তে দেখেছি। শিরা কাটার পর শিকারকে পেড়ে ফেলে দাঁতের কামড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

৬

টমের দেওয়া গুলতির রবারটা নষ্ট হয়ে যেতে আমি একটা গুলি-ধনুক তৈরি করে নিলাম। তীর-ছোড়া ধনুক আর গুলি-ছোড়া ধনুকের মধ্যে তফাত হল এই যে গুলি-ছোড়া ধনুক লম্বায় ছোট, আর তার দুটো ছিলার মাঝখানে একটা চৌকো জাল বোনা থাকে যেখানে গুলিটা রেখে ছোড়া হয়। গুলি-ধনুক ছুড়তে বিশেষ অভ্যাস দরকার হয়, কারণ যে হাতে ধনুকটা ধরা থাকে সে হাতের কব্জিটা যদি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া না হয় তাহলে সে হাতের

বুড়ো আঙুল জখম হবার খুব সম্ভাবনা থাকে। গুলতির দ্বিগুণ বেগে ধনুকের গুলি ছোটে। তবে, গুলতির মত অতটা নিখুঁত এ নয়। নৈনিতালের কোষাগার হল আমাদের গ্রীষ্মকালীন আবাসের ঠিক মুখোমুখি, গুর্খা সেনাবাহিনীর পাহারায়। গুর্খারা ছিল এই ধনুক ছোড়ায় অত্যন্ত নিপুণ, আর তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত। একটা ছোট কাঠের খুঁটি মাটিতে পোতা ছিল, একটা প্রকাণ্ড গোলাকার কাঁসি তাতে বাঁধা ছিল যেটা বাজিয়ে সময় জানানো হত। এই খুঁটির উপর একটা দেশলাইয়ের বাক্স রাখা থাকত, আর সেখান থেকে কুড়ি গজ দূর থেকে আমার প্রতিযোগী আর আমি পালা করে একটা করে গুলি-ধনুক ছুড়তাম। ওদের হাবিলদার ছিল ছোট-খাট মানুষটি, ষাঁড়ের মত গায়ের জোর তার; ওদের মধ্যে তারই হাত ছিল সবচেয়ে ভাল। কিন্তু কখনও সে আমায় হারাতে পারে নি, এবং আমাদের এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পেত।

বাধ্য হয়েই আমায় গুলি-ধনুক ব্যবহার করতে হয়েছিল, এবং পাখি সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করা সত্ত্বেও গুলতির মত অতটা ভাল একে আমার কখনও মনে হয় নি; আর ফেনিমোর কুপারের বইগুলো পড়ার পর আমি গুলি-ধনুকের সঙ্গে একটা তীর-ছোড়া ধনুকও তৈরি করে নিলাম। কারণ, কুপারের বইয়ের রেড-ইণ্ডিয়ানরা যদি তা দিয়ে জীবজন্তু মারতে পারে, আমিই বা কেন পারব না। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা তীর-ধনুক ব্যবহার করে না, তাই তা তৈরি করার কোন নমুনা আমি পাই নি; যাই হোক, কয়েকবার চেষ্টার পর মনের মত একটা ধনুক তৈরি করা গেল; তারপর এই ধনুক আর দুটো তীর নিয়ে (তীরদুটোয় ছুঁচলো লোহা লাগিয়ে নিয়েছিলাম) আমি রেড ইণ্ডিয়ানদের অনুকরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তীরের মারণ-ক্ষমতা বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার কোন অহেতুক উচ্চ ধারণা ছিল না। তাই আমি সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম; বন-মোরগ বা ময়ূর ছাড়াও আমাদের জঙ্গলে এমন অনেক প্রাণী ছিল যাদের আমি অত্যন্ত ভয় করতাম। যা শিকার করব তার কাছে অগ্রসর হবার সুবিধে হবে বলে, আর বিপদের সম্ভাবনা দেখলে গাছে আশ্রয় নিতে পারব বলে খালি পায়ে যেতাম। তখনকার দিনে এখনকার মত তলায় পাতলা রবার দেওয়া জুতো পাওয়া যেত না। তাই হয় খালি পা, নয় তো শক্ত চামড়ার জুতো—এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। এই জুতো হল শিকারের পিছু নেওয়া বা গাছে ওঠা—দু-ব্যাপারেই নিতান্ত অনুপযোগী।

দুটো জলের ধারা এসে আমাদের এলাকার নিচের দিকটায় মিশেছে।

প্রবল বৃষ্টির সময় ছাড়া অন্য সময়ে ধারাদুটি থাকত শুকনো। দুটোরই গর্ত ছিল বালিতে ভরা। এই দুই ধারার মাঝখানে যেখানে তারা মিশেছে সেই নিচু অঞ্চলে প্রায় সিকি মাইল চওড়া আর উপরের দিকে প্রায় এক মাইল চওড়া যে জঙ্গল, সেখানে ছিল সমস্ত রকম শিকারের প্রাণী। যেখানে মেয়েরা স্নান করত সেটা আমাদের এলাকা আর জঙ্গলের মাঝখানে সীমারেখার সৃষ্টি করেছিল, তাই শিকারের সান্নিধ্যে আসতে হলে শুধু এই খালের উপর পাতা একটা গাছ ডিঙিয়ে গেলেই হল। পরবর্তী জীবনে যখন আমার সিনেমা তোলার ক্যামেরা হয়েছিল, এই খালের আমাদের এলাকার দিকের একটা গাছে উঠে কতদিন কাটিয়েছি খালে জল খেতে আসা বাঘের ছবি তোলবার চেষ্টায়। এই জঙ্গলেই আমি আমার শেষ বাঘ শিকার করেছি, হিটলারের যুদ্ধের অবসানে সামরিক বিভাগ থেকে ছাড়া পেয়ে। এই বাঘটা বিভিন্ন সময়ে একটা ঘোড়া, একটা বাছুর আর দুটো বলদ মেরেছিল এবং তাকে তাড়াবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হতে তখন আমি তাকে মেরেছি। আমার বোন ম্যাগির সন্দেহ ছিল আমি হাত ঠিক রেখে বন্দুক ধরতে পারব কি না, কারণ যেভাবে আমি জঙ্গলে অনেক রকম ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগেছিলাম তাতে সে ভেবেছিল হয়ত আমার হাত কাঁপবে। যাই হোক, সম্পূর্ণ যাতে নিশ্চিত হতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমি বাঘটার বিচার করলাম এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমার দিকে তাকানো তার চোখে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে গুলি করলাম। এ যে হত্যাকাণ্ড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডে যুক্তি আছে। আমার ইচ্ছে ছিল, গ্রাম থেকে দুশো গজ দূরের যে ল্যান্টানার ঘন ঝোপটা সে নিজের আবাস বলে বেছে নিয়েছে বাঘটাকে সেখানে বাস করতে দেওয়া, আর যত প্রাণী সে বধ করেছে সে সমস্তর জন্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সারা দেশে এইসব গৃহপালিত পশুর সংখ্যাল্পতার কথা চিন্তা করে আমায় এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, বিশেষ করে যখন দেখা গেল যে তাকে তাড়াবার সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হচ্ছে।

দুই জলধারার মধ্যবর্তী জঙ্গলটা আমি আর ম্যাগগ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ করে দেখেছি; আমি তাই জানতাম কোন্-কোন্ অঞ্চল এড়িয়ে যেতে হবে। এমনকি পড়ে-থাকা গাছটা ধরে খাল পার হয়ে বন-মোরগ আর ময়ূর শিকারে যাওয়াও নিরাপদ মনে করি নি যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হয়েছি যে কোন বাঘ এ এলাকায় নেই। নিশ্চিত হতে পেরেছি জলধারার বাঁ-দিকের জঙ্গলটা পরীক্ষা করে। যে-সব বাঘ এখানে আসত সবাই আসত কেবলমাত্র

পশ্চিম দিক থেকে, আর সূর্যাস্তের সময়টায়। আর, শিকার না পেলে যে গহন জঙ্গল থেকে এসেছিল সূর্যোদয়ের পুর্বেই ফিরে যেত সেখানে। এই শুষ্ক জলধারার বালি পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যেত কোন বাঘ জঙ্গলের দিক থেকে এটা অতিক্রম করেছে কি না এবং করে থাকলেও আবার চলে গেছে কি না। কারণ এ এলাকাটাকে আমি আমার নিজস্ব সংরক্ষিত এলাকা বলে মনে করতাম। যখন দেখতাম তাতে কেবলমাত্র আসার চিহ্নই রয়েছে, মানে মানে সেখান থেকে সরে পড়ে অন্যত্র পাখির খোঁজে যেতাম।

এই জলধারার প্রতি আমার আকর্ষণের অন্ত ছিল না। কারণ শুধু তো বাঘ নয়, দু-দিকের বহু মাইল ব্যাপী জঙ্গলে যত জন্তু যত সরীসৃপ এর উপর দিয়ে যেত, যে চিহ্ন তারা রেখে যেত ফোটোগ্রাফের মতই তা ছিল আমার কাছে স্পষ্ট। এইখানেই আমি প্রথমে গুলতি, তার পরে ধনুক, তার পরে গাদা-বন্দুক আর সব-শেষে আধুনিক রাইফেল নিয়ে একটু একটু করে জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, খালি পায়ে এগোতে থাকি নিঃশব্দে। কোন না কোন সময়ে জঙ্গল থেকে আসা সবরকম প্রাণীর সঙ্গে পরিচয় হতে থাকে এবং এমন দিন আসে যখন আমি চিহ্ন দেখেই কোন্ প্রাণী এসেছিল তা বলে দিতে পারি। কিন্তু এ হল সামান্য সূত্রপাত ছাড়া কিছু নয়, কারণ জীবজন্তুর অভ্যাস, তাদের ভাষা, প্রকৃতির পরিকল্পনায় তাদের কার কী অংশ— এ সবই তখনও আমার শেখা বাকি। এসব চিত্তাকর্ষক ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে আমি পাখিদের ভাষাও শিখতে শুরু করলাম। প্রকৃতির উদ্যানে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধেও আমার ধারণা হতে লাগল।

প্রথমে আমি পাখি আর জন্তু আর সরীসৃপদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেললাম। শুরু করলাম পাখিদের দিয়ে। ছ-টা ভাগে ভাগ করলাম তাদের :

(ক) যে-সব পাখি প্রকৃতির উদ্যানকে সুন্দর করে তোলে। এই ভাগে হল : সাতসতী, হলদে পাখি প্রভৃতি।

(খ) যে-সব পাখি তাদের গানে এই উদ্যান মুখর করে তোলে : দামা, দোয়েল, শ্যামা।

(গ) যে-সব পাখি এই উদ্যানকে নতুন করে গড়ে তোলে : বসন্তবাউরি, ধনেশ, বুলবুল।

(ঘ) যে-সব পাখি বিপদের সংকেত জানায় : ফিঙে, লাল বন-মোরগ, ছাতারে।

(ঙ) যে-সব পাখি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে: ঈগল, বাজপাখি, পেঁচা।

(চ) যে-সব পাখি মুর্দাফরাসের কর্তব্য করে: শকুনি, চিল, কাক।

জন্তুদের ভাগ করলাম পাঁচ ভাগে:

(ছ) যে-সব জন্তু প্রকৃতির উদ্যানকে সুন্দর করে তোলে: হরিণ, কৃষ্ণসার, বানর।

(জ) যে-সব জন্তু এই উদ্যানকে নতুন করে গড়ে তোলে মাটি খুঁড়ে আর তাকে বাতান্বিত করে: ভাল্লুক, শুয়োর, শজারু।

(ঝ) যে-সব জন্তু বিপদের সঙ্কেত করে: হরিণ, বানর, কাঠবেড়ালি।

(ঞ) যে-সব জন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে: বাঘ, চিতাবাঘ, বন-কুত্তা।

(ট) যে-সব জন্তু মুর্দাফরাসের কাজ করে: হায়েনা, শেয়াল, শুয়োর।

সরীসৃপদের আমি দুই ভাগে ভাগ করলাম:

(ঠ) যে-সব সাপ বিষাক্ত তাদের এই এই দলে ফেললাম: কেউটে, চন্দ্রবোড়া, কিরাইত ইত্যাদি।

(ড) যে-সব সাপ বিষাক্ত নয়: ময়াল, ঢ্যামনা ইত্যাদি।

প্রধান প্রাণীদের এভাবে ভাগ করবার পর জঙ্গলের আর-আর যেসব প্রাণী এই ধরনের কাজ করত, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারাও ক্রমশ আমার তালিকাভুক্ত হল। এর পরের কাজ হল এইসব জঙ্গলের বাসিন্দাদের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর যে সব পাখির বা জন্তুর ডাক অনুকরণ করা মানুষের ঠোঁটে আর গলায় সম্ভব তা শেখা। প্রতিটি পাখির আর জন্তুর নিজস্ব ভাষা আছে, এবং—সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে—এক জাতের প্রাণী অন্য জাতের ভাষায় কথা কইতে না পারলেও জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীই পরস্পরের ভাষা বোঝে। ব্যতিক্রমের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তিনটি: ভিমরাজ, শ্রাইক (শিকারী পাখি-বিশেষ) আর হরবোলা। পাখি-প্রেমিকদের কাছে ভিমরাজ হল প্রচুর আনন্দ ও কৌতুহলের উৎস। কারণ কেবলমাত্র যে সবচেয়ে দুঃসাহসী প্রাণী তাই নয়, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সে সমস্ত পাখির, এবং জন্তুর মধ্যে চিতল হরিণের ডাক অনুকরণ করতে পারে। তা ছাড়া রসিকতায়ও তার জুড়ি নেই। বন-মোরগ

বা ছাতারে বা দামা, যারা মাটিতে ঠুকরে খায় তাদের সঙ্গে মিশে কোন মরা ডালে সুবিধে-মত জায়গায় বসে সে নিজের আর অন্য পাখিদের গানে বন মাতিয়ে তোলে আর সেইসঙ্গে বাজপাখি, বেড়াল, সাপ আর গুলতি-হাতে ছোট ছোট ছেলে ইত্যাদি শত্রুদের উপর লক্ষ্য রাখে, এবং তার বিপদ-সঙ্কেত কোন প্রাণী অবহেলা করে না। এর পুরস্কার-স্বরূপ, যাদের সে পাহারা দেয় তাদের কাছে খাবার পেয়ে থাকে। কিছুই তার তীক্ষ্ণ চোখ এড়াতে পারে না এবং যে-মুহূর্তে সে দেখে কোন পাখি তার নিচে শুকনো পাতার রাশি সরাতে সরাতে কোন পুরুষ্টু শতপদী বা সরস বিছে আবিষ্কার করেছে, চিৎকার করতে করতে সে বাজপাখির মত তীরবেগে নেমে আসে কিংবা যে পাখির কবল থেকে সে সেটা ছিনিয়ে নিতে চায়, বাজপাখি ধরলে সে যেমন করে চেঁচিয়ে ওঠে তেমনি করে চেঁচিয়ে ওঠে। এবং দশ বারের মধ্যে ন-বার সে তা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে অবসর-মত খেয়ে ফেলে। খাওয়া সেরে আবার তার গান শুরু করে।

ভিমরাজের আবার চিতল হরিণের সান্নিধ্যেও দেখা মেলে। উচ্চিংড়ে বা অন্য যে-সব পোকা হরিণের উপস্থিতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের খেতে থাকে সে। হয়ত একটা চিতল কোন বাঘ বা চিতাবাঘ দেখে সঙ্কেত-সূচক শব্দ করে উঠল, সেই ডাক শিখে নিয়ে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করল তা। একবার আমার উপস্থিতিতেই একটা চিতাবাঘ একটা এক-বছর-বয়স্ক চিতলকে মারে। চিতাবাঘটাকে কয়েকশো গজ দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আমি সেই মড়িটার কাছে গেলাম। তারপর একটা ছোট ঝোপ থেকে খানিকটা লতা নিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখলাম সেটাকে। কাছে-পিঠে উপযুক্ত কোন গাছ না থাকায় একটা ঝোপের দিকে পেছন করে বসলাম, সিনেমা তোলার ক্যামেরাটা কোলের কাছে নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল একটা ভিমরাজ আর তার সঙ্গে একঝাঁক সাদা-গলা পেঙা। মড়িটা চোখে পড়তে ভিমরাজটা সেটাকে ভাল করে দেখবে বলে কাছে এগিয়ে আসতে আমায় দেখতে পেল। মড়ির দেখা পাওয়াটা তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু নয় বটে, কিন্তু আমার উপস্থিতিতে ঘাবড়ে গেল সে। যাই হোক, যখন সে বুঝল যে আমি কোন বিপজ্জনক প্রাণী নই, সে তার সঙ্গীদের কাছে উড়ে গেল—তারা তখন মাটিতে বসে প্রচুর চিৎকার করে চলেছিল। পাখিগুলো ছিল আমার বাঁ-দিকে। আমি আশা করছিলাম যে চিতাবাঘটা আমার ডান দিক থেকে আসবে, এমন সময় ভিমরাজটা চিতল হরিণের সাবধানী ডাক ডেকে উঠল, আর সে ডাক শুনেই সাদা-গলা পাখিগুলো—সংখ্যায় তারা পঞ্চাশটার কম নয়—একসঙ্গে উড়ে

চিৎকার করতে করতে উপরের গাছগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল আর সেখান থেকে সাবধানী ডাক শুরু করল। ভিমরাজটাকে লক্ষ্য করে আমি অদৃশ্য চিতাবাঘটার সমস্ত নড়াচড়াই আন্দাজ করতে পারছিলাম। পাখিগুলোর চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে চিতাবাঘটা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল ঠিক আমার পেছনে। যে ঝোপটার সামনে আমি বসে ছিলাম তাতে প্রায় পাতা ছিল না বললেই হয়, তাই আমায় দেখতে পেয়েই চিতাবাঘটা নিচু গলায় একটা গর্জন তুলে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আর ভিমরাজটা চলল তার পিছু-পিছু। ভিমরাজটা এতক্ষণে ব্যাপারটা খুব উপভোগ করেছে। যেভাবে সে চিতল হরিণের ডাক অনুকরণ করে চলেছিল তা যুগপৎ আমার বিস্ময় ও ঈর্ষ্যা জাগ্রত করল, কারণ একটা বিশেষ ডাকে যদি বা আমি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতাম, চিতলের বিভিন্ন বয়সের ডাকের যে পার্থক্য সে এত তাড়াতাড়ি আর এত নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে চলেছিল আমার পক্ষে তা ছিল অসম্ভব।

মাটিতে জায়গা নেবার সময়েই আমি জানতাম যে চিতাবাঘটা মড়িতে ফিরে আসার মুহূর্তেই আমায় দেখতে পাবে এবং আমার আশা ছিল যে মড়িটা যখন সে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে তার সেই সময়কার ছবি তুলব। ভিমরাজটার লক্ষ্য এড়িয়ে চিতাবাঘটা দ্বিতীয় বার ফিরে এল এবং আমার উপস্থিতির জন্যে আর ক্যামেরার শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করলেও আমি কুড়ি গজ দূরে থেকে তার ছবি তুললাম। যে লতা দিয়ে মড়িটা বেঁধে রেখেছিলাম সেটা ছিঁড়ে শিকারকে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে টানাটানি করেছিল তার ছবি তুললাম পঞ্চাশ ফুট ফিল্মে।

ভিমরাজদের কথা কইতে শেখানো যায় কি না আমি জানি না, তবে, তারা যে শিস দিতে পারে সে পরিচয় আমি পেয়েছি। কয়েক বছর আগে বেঙ্গল অ্যাণ্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের (এখন যার নাম আউধ-ত্রিহুত রেলওয়ে) মানকাপুর স্টেশনের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশন-মাস্টার ভিমরাজ আর শ্যামা পাখিদের গানের সুরে শিস দিতে শিখিয়ে দিব্যি আয় বাড়াতেন। জংশন স্টেশনটায় গাড়ি প্রাতরাশের জন্যে থামলে প্রায়ই দেখা যেত যাত্রীরা স্টেশন-মাস্টারের বাংলোর দিকে ছুটছে পাখির গান শুনতে আর ফিরছে খাঁচায় করে একটা পাখি নিয়ে, যে পাখি তাদের সবচেয়ে প্রিয় গান শিস দিয়ে গাইতে পারে। এই পাখি, আর একটা রঙবাহার খাঁচার জন্যে স্টেশন-মাস্টার নিতেন ত্রিশ টাকা করে।

৭

প্রকৃতির শিক্ষার শুরুও নেই শেষও নেই এ কথা বলছি বলে এ দাবি কিন্তু আমার একেবারেই নেই যে এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা কিছু শেখবার সব আমি শিখেছি, কিংবা এ বই কোন বিশেষজ্ঞের লেখা। তবে, জীবনের এতগুলো দিন প্রকৃতির সঙ্গে কাটিয়ে আর জঙ্গলের গাথাকে অবসর বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করে যে সামান্য জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তা আমি নিঃশেষে লিপিবদ্ধ করছি। এ অহঙ্কারও আমার নেই যে পাঠক আমার সিদ্ধান্ত আর বক্তব্য মেনে নেবেন। কিন্তু তা-বলে সেজন্যে যে কোন কলহের সম্ভাবনা আছে তা নয়, কারণ কোন দু-জন মানুষ কখনো কোন বিষয়কে ঠিক এক চোখে দেখে না। মনে করুন তিন জন লোক একটা গোলাপ ফুল দেখছে। একজন দেখবে তার রঙটা শুধু, একজন হয়ত শুধু আকৃতিটা, আর একজন হয়ত দেখবে তার রঙ আর আকৃতি দুই-ই। তিনজনেই যা দেখতে চেয়েছিল তাই দেখেছে, এবং তিনজনের কারুরই দেখায় ভুল হয় নি। যুক্ত-প্রদেশের বর্তমান রাজ্যপালের সঙ্গে কোন আলোচ্য বিষয়ে আমার মতান্তর হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা আমাদের মতান্তর মেনে নিয়েও বন্ধুভাবে থাকতে পারি।’ তাই বলছি, কোন পাঠক যদি কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত না হন তাতে আমাদের বন্ধুত্বে বাধা কোথায়!

যে-সব জন্তুর পায়ের দাগ প্রায় এক রকম, প্রথমটা আমার তাদের পার্থক্য বুঝতে অত্যন্ত অসুবিধে হত। যে-সব অল্পবয়স্ক সম্বর আর অল্পবয়স্ক নীলগাইয়ের ছাপের সঙ্গে বড় শুয়োরের পায়ের ছাপের মিল প্রচুর, জলপথ পার হবার সময় তাদের লক্ষ্য করে আর তাদের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে একবার তাকিয়েই আমি শুয়োরের পায়ের ছাপের সঙ্গে অন্য যে-কোন দ্বিধা-বিভক্ত-খুর-বিশিষ্ট জন্তুর পায়ের ছাপের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারছি। হরিণদের মত শুয়োরদেরও প্রধান খুরের পেছনে মৌলিক খুর থাকে, কিন্তু এই মৌলিক খুর হরিণের চেয়ে শুয়োরের বেশি লম্বা হয়ে থাকে এবং শক্ত মাটির উপর চলার সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই মৌলিক খুরের ছাপ দেখা যায় স্পষ্ট। কিন্তু হরিণের বেলায় এই মৌলিক খুরের ছাপ তখনই মাত্র দেখা যায় যখন প্রধান খুরগুলো মাটিতে বসে গেছে। অনভিজ্ঞের চোখে বাঘের বাচ্চার পায়ের ছাপ আর চিতাবাঘের পায়ের ছাপের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে না যখন ওরা এক রকম

মাটিতে চলাফেরা করে। এই পার্থক্য ধরা পড়ে পায়ের আঙুলের ছাপ দেখে। কারণ বাঘের বাচ্চার পায়ের আঙুল চিতাবাঘের চেয়ে অনেক, অনেক বড়।

হায়েনার আর বন-কুত্তার পায়ের ছাপের সঙ্গে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ প্রায়ই গুলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সন্দেহ জাগলে দুটো মৌলিক নিয়ম প্রয়োগ করা যেতে পারে :

(ক) যে-সব জন্তু তাড়া করে শিকার ধরে তাদের পায়ের পাতার তুলনায় নখ বড়। আর যারা গুঁড়ি মেরে শিকার করে তাদের পায়ের পাতার তুলনায় নখ ছোট।

(খ) যে-সব জন্তু তাড়া করে শিকার ধরে তাদের পায়ের নখের ছাপ দেখা যায়। এবং (ভয়-পাওয়া অবস্থায় অথবা লাফাতে যাবে এমন অবস্থায় ছাড়া) আর যে-সব জন্তু গুঁড়ি মেরে শিকার করে তাদের নখের ছাপ দেখা যায় না।

বাড়ির কুকুর আর বেড়ালের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করলে বুঝবেন, প্রথমটির বেলায় বড় আঙুল আর ছোট পায়ের পাতা, আর পরেরটির বেলায় ছোট আঙুল আর বড় পায়ের পাতা বলতে আমি কী বুঝি।

যেখানে সাপ প্রচুর সে অঞ্চলে বাস করতে হলে সাপের চলার চিহ্ন দেখে জানতে পারা ভাল সাপটা কোন্ দিকে গেছে,—অন্তত মোটামুটি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারা ভাল যে সাপটা বিষাক্ত কি না। সাপটা কত মোটা তাও তার চলার পথ দেখে আন্দাজ করা সম্ভব। এই তিনটি বিষয় একে-একে আলোচনা করছি।

(ক) কোন্ দিকে গেছে। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কল্পনা করুন এমন একটা মাঠ যেখানে ছ-ইঞ্চি উঁচু গাছ ঘনসন্নিবদ্ধভাবে রয়েছে। যদি আপনাকে এই মাঠের উপর ডান দিক থেকে বাঁ দিকে রোলার চালাতে হয় তাহলে লক্ষ্য করবেন যে রোলারটা যেদিকে গেছে গাছগুলো সেদিকে মাটিতে শুয়ে পড়েছে; সুতরাং রোলার টানাটা না দেখলেও সহজেই বুঝবেন যে রোলারটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চালানো হয়েছে। চোখের দৃষ্টি যদি খুব ভাল না হয় তাহলে আতস কাঁচ নিয়ে খানিকটা বালি বা ধুলো ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, এই বালি আর ধুলোর কণাই অন্যান্য বস্তুর কণার উপরে রয়েছে। এই উঁচু-হওয়া কণাগুলোকে বলা যাক, 'পাইল'। কোন সাপ যখন বালি বা ধুলোর উপর দিয়ে চলে যায় এই পাইল তখন সাপটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে কাত হয়ে পড়ে, রোলারের ব্যাপারে যেমনটি আমরা দেখেছি। বালি বা ধুলো বা ছাই, যার উপর দিয়ে সাপ চলে যায় সে সমস্তর উপরেই এই পাইল

থাকে। সুতরাং এ কথা মনে রাখলে, সাপটা কোন্ দিকে গেছে তা হিসেব করতে আর ভুল হবে না, পাইলের অবস্থা দেখেই তা বুঝতে পারা যাবে।

(খ) বিষাক্ত কি না। লক্ষ্য করে থাকবেন, আমি বলেছি কোন সাপের চলার চিহ্ন দেখে সে সাপ বিষাক্ত কি বিষাক্ত না এ-কথা একরকম নির্ভুলভাবেই বলা যায়—সাপটা কোন্ দিকে গেছে তা নির্ণয় করার মতই। চলার পথ দেখে সাপটা কোন্ জাতের তা নির্ণয় করারও ধরা-বাঁধা নিয়ম কিছু নেই। ভারতে তিনশোরও বেশি বিভিন্ন জাতের সাপ আছে। যদিও আমি তাদের কয়েকটির মাত্র চলার দাগ লক্ষ্য করেছি, তা থেকে সাপের জাত বুঝতে যে সাধারণ নিয়ম আমি আবিষ্কার করেছি তাতে মাত্র দুটো ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েছে। এই দুটো হল—বিষাক্ত সাপের মধ্যে শঙ্খচূড়, আর নির্বিষ সাপের মধ্যে পাইথন।

এই দুই ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বিষাক্ত সাপেরা হয় শিকারের প্রতীক্ষায় থাকে, আর নয় তো শিকারের দিকে অগ্রসর হয়। তাই তাদের গতিবেগ বিশেষ দ্রুত হবার দরকার হয় না, অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতেই তারা চলাফেরা করে এবং আস্তে চলতে গেলে সাপকে অত্যন্ত আঁকাবাঁকা গতিতে চলতে হয়। যেমন ধরুন, চন্দ্রবোড়া বা করাইত সাপ, ভারতের সবচেয়ে মারাত্মক সাপ যা। এ-হেন একটা সাপ যদি বালি বা ধুলোর উপর দিয়ে চলে তাহলে লক্ষ্য করবেন যে ছোট ছোট প্রচুর আঁকাবাঁকা রেখায় সে চলেছে। সাপের চলে-যাওয়া পথটা লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে তাই। তাই, যদি আপনি দেখেন কোন সাপ খুব আঁকাবাঁকা চিহ্ন রেখে গেছে, তাহলে একরকম নিশ্চিত হতে পারেন যে এ কোন বিষাক্ত সাপের চিহ্ন। শঙ্খচূড়রা বলতে গেলে কেবলমাত্র অন্য জাতের সাপ খেয়ে বেঁচে থাকে; তাই তাদের ভক্ষ্যদের অনেকে দ্রুতগতি হওয়ার ফলে তাদের যে গতিবেগ হয়েছে তা নাকি ঘোড়ার গতিবেগের সমান। অবশ্য এ বিষয়ে আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না, কারণ ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় আমি কখনো এই সর্পরাজের তাড়া খাইনি। এরা লম্বায় এমনকি সতেরো ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। যাই হোক, চোদ্দ ফুট লম্বা কয়েকটা সাপ মারার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তারা দ্রুতগতি, এবং আমার ধারণা, এই গতিবেগের কারণ হল তাদের ভক্ষ্য অন্যান্য সাপের দ্রুত গতি। আমি যে ব্যতিক্রমের কথা বলেছি তা বাদ দিলে নির্বিষ সাপেরা হয় চিকণ-দেহ, চটপটে ও ক্ষিপ্রগতি, এবং এদের কয়েকটি—যথা, ঢ্যামনা বা কালো পাহাড়ি সাপ, অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটতে পারে। নির্বিষ সাপের ক্ষিপ্র গতির প্রয়োজন শিকার ধরার বা শত্রুকে পেছনে ফেলে পালানোর ব্যাপারে—কারণ শত্রু তাদের অসংখ্য। খুব দ্রুত বেগে চলার সময় সাপ যে চিহ্ন রেখে যায় তা প্রায়

সিধে ; আর যেখানে যেখানে ঈষৎ অসমান রেখা দেখা যায় সে-সব জায়গায় সাপের পেট কেবলমাত্র উঁচু জায়গাগুলোই স্পর্শ করে, নিচু জায়গায় চলার কোন দাগ পড়ে না। তাই সাপের দাগ মোটামুটি সিধে হলে একরকম ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে দাগ নির্বিষ সাপের দাগ। একমাত্র শঙ্খচূড় সাপের দাগের সঙ্গেই নির্বিষ সাপের দাগ গুলিয়ে ফেলা সম্ভব, তবে, সে সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প, কারণ শঙ্খচূড় সাপ অতি বিরল, এবং কেবলমাত্র বিশেষ-বিশেষ এলাকাতেই তার দেখা মেলে।

(গ) বেড়। চলার দাগ দেখে সাপের বেড হিসেব করতে হলে সে দাগের মাপ কয়েকটা জায়গায় নিতে হবে, তারপর গড়ে যে মাপ পাওয়া যাবে তাকে চার দিয়ে গুণ করলে সাপের বেড়ের হিসেব মিলবে। এ হিসেব অবশ্য একেবারে নিখুঁত হবে না, তবে এ থেকে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। নিখুঁত হবে না এইজন্যে যে, দাগটা নির্ভর করে, অনেকাংশে যে জমির উপর দিয়ে সাপটা চলে গেছে তার উপর। যেমন ধরুন, যদি হালকা ধুলোর উপর দিয়ে হয় তাহলে যা দাগ পড়বে, পুরু ধুলোর উপরের দাগের চেয়ে তা হবে বেশি চওড়া।

ভারতে প্রতি বছর কুড়ি হাজার মানুষ সর্পাঘাতে প্রাণ দেয়। আমার বিশ্বাস, এই কুড়ি হাজারের মাত্র অর্ধেক-সংখ্যক মানুষ সাপের বিষে মারা যায়, বাকি অর্ধেক মারা যায় নির্বিষ সাপের কামড়ে—মানসিক আঘাতে, কিংবা আতঙ্কে, অথবা এই দুটি কারণ মিলিয়ে। হাজার হাজার বছর সাপের সঙ্গে বাস করেও ভারতীয়দের সাপ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প যে তা ভাবতেও অত্যন্ত অবাক লাগে : মাত্র কয়েকটা সাপ বাদে প্রায় সমস্ত সাপকেই তারা বিষাক্ত বলে মনে করে। কোন বড় সাপের কামড় খেলে মানুষ স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাই তার উপর যখন আবার তার এই ধারণা হয় যে সে সাপ বিষাক্ত সাপ এবং তার আর জীবনের কোন আশা নেই, তখন আর এত লোকের নির্বিষ সাপের কামড়ে মারা পড়ার ব্যাপারে (অর্থাৎ আমার যা বিশ্বাস) আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভারতের অধিকাংশ গ্রামেই কিছু লোক আছে যাদের সাপের বিষ সারাবার ক্ষমতা আছে শোনা যায়। ভারতের মাত্র শতকরা দশ ভাগ সাপ বিষাক্ত হওয়ায় তাদের এই সুনামটা সহজেই গড়ে উঠেছে। এ-জন্যে তারা কোন পয়সা নেয় না এবং গরিব মানুষদের মধ্যে প্রচুর ভাল কাজ করে থাকে ; এবং যদিও কোন বিষাক্ত সাপের কামড়ে ওষুধ বা মন্ত্র কোন কাজে লাগে না, কিন্তু নির্বিষ সাপের কামড় থেকে তারা বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে থাকে তাদের মধ্যে সাহস আর আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করে।

ভাবতের প্রায় সমস্ত হাসপাতালে সর্পাঘাতের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু যেহেতু গরিব মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে কিংবা বন্ধুবান্ধবের কাঁধে উঠে ছাড়া যাবার উপায় নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই তারা এত দেরি করে হাসপাতালে পৌঁছয় যখন আর বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় কোন কাজ হবার সময় থাকে না। সমস্ত হাসপাতালেই বিষাক্ত সাপের চার্ট টাঙানো থাকে। যেখানে যেখানে বিষাক্ত সাপ মারলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় সে-সব জায়গা ছাড়া অন্যত্র এ চার্টের কোন মূল্যই নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খালি-পা মানুষ রাত্রিকালে সাপের কামড় খেয়ে থাকে, ফলে যে সাপ কামড়ালো তাকে দেখা যায় না। তা ছাড়া একটা অদ্ভুত ধারণা মানুষের মধ্যে বহুল পরিমাণে রয়ে গেছে যে, যে সাপ কামড়েছে তাকে যদি সে মানুষ মেরে ফেলে তাহলে সেই সাপও তাকে মেরে ফেলে। এর ফলে সর্পাহত ব্যক্তি প্রায় কোন ক্ষেত্রেই, যে সাপ তাকে কামড়েছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে না, আর ফলে ডাক্তাররাও বুঝতে পারে না সে সাপ বিষাক্ত না নির্বিষ।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ জাগলে আমি প্রথমে সাপটাকে মেরে ফেলি, তারপর তার মুখটা পরীক্ষা করে দেখি। যদি দেখি তার দু-সারি দাঁত আছে তাহলে বুঝতে পারি যে সে নির্বিষ। আর যদি দেখি উপরের চোয়ালে দুটো দাঁত (এ দুটো থাকে চন্দ্রবোড়া গোষ্ঠীর মত ভাঁজ করা বা গোক্ষুর গোষ্ঠীর মত শক্ত করে বসানো), তখন বুঝি যে সে সাপ বিষাক্ত। প্রথমোক্ত সাপে কামড়ালে অনেকগুলো দাঁতের দাগ দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সাপের কামড়ে মাত্র দুটো, এবং কখনো কখনো একটা কামড়ের দাগ দেখা যায়—এটা হয়, যখন সাপটা যাকে কামড়াবে তার সঙ্গে সমকোণে না থাকে কিংবা যে জায়গায় কামড়েছে, যথা একটা হাতের আঙুল বা পায়ের আঙুল, তা বেজায় ছোট হওয়ায় দুটো দাঁত একসঙ্গে বসানোর জায়গা সেখানে নেই।

৮

জঙ্গলের প্রাণীদের ভাষা শেখা যেমন আমার পক্ষে কঠিন হয়নি তেমনি কোন-কোন পাখির বা জন্তুর ডাক অনুসরণ করাও আমার পক্ষে কঠিন হয়নি, কারণ আমার শ্রবণ-শক্তি ভাল ছিল, আর বয়স কম থাকায় গলার স্বর-নিঃসরক অংশগুলি নমনীয় ছিল। শুধু ডাক শেখা বা প্রতিটি প্রাণীর ডাক শুনে তা ঠিকমত চিনতে পারাই যথেষ্ট নয়, কারণ যে-সব পাখির কাজ হল সুরঝঙ্কারে প্রকৃতির কানন পূর্ণ

করা তারা ছাড়া আর কোন প্রাণীই বিনা কারণে ডাকে না, এবং সে ডাক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

একদিন আমি একটা গাছে বসে একপাল চিতল হরিণকে লক্ষ্য করছিলাম। হরিণগুলো ছিল একটা ফাঁকা জায়গায়। পালে ছিল পনেরোটা হরিণ হরিণী, আর প্রায় এক বয়সের পাঁচটা হরিণ-শিশু। একটা বাচ্চা রোদে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, দাঁড়িয়ে উঠল সেটা; তারপর শরীরটা লম্বা করে, চার পা তুলে দৌড়তে-দৌড়তে গেল একটা পড়ে-থাকা গাছের কাছে। এ থেকে বুঝতে হবে যে সে তার সঙ্গীদের ইঙ্গিত করছে দৌড়োদৌড়ি খেলায় তার সঙ্গে যোগ দিতে। পাঁচটা বাচ্চাই লাফাতে লাফাতে বেমালুম গাছটা ডিঙিয়ে চলে গেল, তারপর খানিকটা পাক খেয়ে, খানিকটা দৌড়ে আবার এসে গাছটা ডিঙিয়ে এপারে এল। এই দ্বিতীয় লাফের পর দলের সর্দার জঙ্গলের দিকে চলল, আর বাকি সকলে চলল তার পিছু-পিছু। একটা হরিণী শুয়ে ছিল, সে এবার উঠে দাঁড়াল। তারপর বাচ্চাগুলো যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে পলাতক বাচ্চারা আবার ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। দলের বড়-বড় প্রাণীদের কিন্তু এ-সব ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র হল না, তেমনি শুয়ে রইল তারা বা ঘাস চিবিয়ে চলল। এই ফাঁকা জায়গাটার কাছ দিয়েই কাঠুরেদের একটা পায়ে-চলা পথ চলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একজন লোক কুড়ুল কাঁধে সেই পথ ধরে আসছে। আমার উঁচু জায়গা থেকে আমি অনেক দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কারণ যেদিক থেকে সে আসছিল সেদিকে জঙ্গল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। হুদের শ-খানেক গজের মধ্যে এসে পড়তেই একটা হরিণী তাকে দেখতে পেল। অমনি একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠল এবং একটুও ইতস্তত না করে সমস্ত দলটা সবেগে ঘন ঝোপের দিকে ছুটে গেল।

উদ্বিগ্ন মায়ের বাচ্চাকে ডাকার ডাক আর হরিণটার সাবধানী ডাক আমার অনভিজ্ঞ কানে অবিকল একই রকম মনে হল। অনেক অভিজ্ঞতা লাভের পর পরবর্তীকালে আমি জেনেছিলাম যে বিভিন্ন জন্তুর বা বিভিন্ন প্রাণীর ডাকের মধ্যে যে পার্থক্য তা যে ডাকটারই উপর তা নয়, আওয়াজের সুরের উপরেও। কুকুরের ডাক আমরা শুনি, আমরা জানি কখন সে ডাকছে তার মনিবকে অভ্যর্থনা করতে, কখন দৌড়ের উত্তেজনায়, কখন কোন তাড়া-খাওয়া বেড়াল গাছে উঠে পড়লে ব্যর্থ আক্রোশে, কখন অজানা মানুষ দেখে রাগে, কখন বা স্রেফ বেঁধে রাখা হয়েছে বলে। প্রতি ক্ষেত্রেই তার আওয়াজের সুর শুনেই আমরা বুঝি কখন কী কারণে সে ডাকছে।

যখন আমার অভিজ্ঞতা এমন স্তরে এসে পৌছল যে জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীকে তাদের ডাক শুনে চিনতে পারি, সে ডাকের কারণ বুঝতে পারি আর তাদের বেশির ভাগের ডাকই এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারি যে তা শুনে কিছু পাখি বা কিছু পশু আমার কাছে আসে বা আমার পিছু পিছু চলে, জঙ্গলের প্রতি তখন এক নতুন আকর্ষণ আমার মধ্যে জাগল, কারণ এখন আর কেবলমাত্র বনের যেটুকু চোখে দেখেছি সেটুকুই নয়, আমার কৌতূহল এখন সুদূরপ্রসারী হয়ে শ্রবণ-শক্তির সীমানা স্পর্শ করেছে। প্রথমেই কিন্তু দরকার, শব্দ কোথা থেকে আসছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। যে-সব প্রাণীর আতঙ্কের মধ্যে দিন রাত কাটে, শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ে তাদের ভুল হয় না এবং তেমন ভয় পেলে অমনটি শেখা মানুষের পক্ষেও সম্ভব। যে সব আওয়াজ বনের প্রাণী বার-বার করে—এই যেমন কোন হনুমানের চিতাবাঘ দেখে কিংবা কোন চিতলের সন্দেহজনক কোন নড়াচড়ার আভাস পেয়ে অথবা কোন সম্বরের বাঘের সাড়া পেয়ে ডেকে ওঠা—এই শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে তা আন্দাজ করা শক্ত নয়,—তা ছাড়া এমন কোন বিপদের সঙ্কেত সেগুলো নয় যে-জন্যে তক্ষুনি ব্যবস্থা করতে হবে। যে শব্দ মাত্র একবার শোনা যায়—যথা, কোন ডালপালা ভাঙার শব্দ, কোন চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন, অথবা কোন পশু বা পাখির একটিমাত্র সাবধানী ডাক যেটা ঠিক কোথা থেকে আসছে আন্দাজ করা কঠিন, সেটাই আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস,—তখন সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতার প্রয়োজন। অনেকটা প্রাণের দায়েই আমাকে শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করতে, অর্থাৎ ঠিক কোন্ দিক থেকে আর কতটা দূর থেকে শব্দ আসছে তা আন্দাজ করতে শিখেছিলাম। আন্দাজ করতে শিখেছিলাম অদেখা বাঘ বা চিতাবাঘ কোথায় কি-ভাবে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে—দিনের বেলা জঙ্গলের মধ্যে আর রাতে বিছানায় শুয়েই হোক,—কারণ আমাদের বাড়িটার এমন জায়গায় অবস্থিতি যেখান থেকে জঙ্গলের সমস্ত শব্দ কানে আসে।

স্টিফেন ডীজকে আমি যে-সব পাখি দিয়েছিলাম তার প্রতিদান হিসেবে তিনি পূর্বোল্লিখিত বন্দুকটা আমায় দিয়েছিলেন। এটা একটা দোনলা গাদা বন্দুক। নতুন অবস্থায় বন্দুকটা নিশ্চয় ভালই ছিল, কিন্তু বারুদ বেশি গাদা হয়ে হয়ে পরবর্তীকালে ওটার একটা নল ফেটে গেছে, উপযোগিতা অর্ধেক হয়ে গেছে। বিস্ফোরণের ফলে স্টকটাও গেছে ভেঙে। স্টিফেনের কাছ থেকে যখন এটা পাই নলদুটো তখন স্টক-এর সঙ্গে তামার তার দিয়ে কোন রকমে বাঁধা ছিল। যাই হোক, আমার বন্ধু চোরা-শিকারী কুঁয়র সিং বললে যে বাঁ নলটা ভালই আছে আর

তাতেই দিব্যি কাজ চলবে। তার এই ভবিষ্যৎ-বাণী পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ দু-দুটো শীতকাল আমি ঐ বন্দুকটার সাহায্যেই সুবৃহৎ সংসারের সকলের মত বন-মোরগ আর ময়ূর শিকার করেছিলাম এবং একবার এতটা কাছে গিয়ে একটা চিতল হরিণ শিকার করেছিলাম যেখান থেকে চার নম্বর গুলিতে তাকে শিকার করা সম্ভব,—এ ঘটনাটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই গাদা বন্দুক দিয়ে যত পাখি আমি শিকার করেছি সে সব বসা অবস্থায়। গুলি-বারুদ ছিল দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হত একটা গুলিও যাতে বিফল না হয়। কোনদিন সকালে বা বিকেলে যদি দুটো কি তিনটে গুলি ব্যবহার করে থাকি তাহলে দুটো কি তিনটে পাখিই নিয়ে ফিরেছি, এবং অন্য কোন ভঙ্গিতে পাখি মেরেই আমি এতটা তৃপ্তি পেতাম না।

দুই জলধারার মধ্যবর্তী জঙ্গলের উপরের যে পাদশৈলের কথা আগে বলেছি একদিন সন্ধ্যায় আমি সেখান থেকে ফিরছি। কয়েক সপ্তাহই আবহাওয়া খুব শুকনো ছিল, যে-জন্যে গুঁড়ি মেরে এগোনো হয়ে উঠেছিল কষ্টকর এবং যখন আমি গুলি-বারুদের থলেয় করে একটা কালিজ আর একটা বন-মোরগ নিয়ে ফেরার পথ ধরেছি, যেখান থেকে কালিজটাকে গুলি করেছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে নীলচে কালো রঙের একটা মেঘ পশ্চিমের একটা পাহাড়ের কাঁধের উপর দেখা দিল। মেঘটা ছিল ভয়াল, বিশেষ করে কিছুদিন থেকেই যে শুকনো আবহাওয়া চলেছে আর তার উপর আজ সারাটা দিন যে-রকম একটুও বাতাস নেই, তাতে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। পাদশৈল অঞ্চলের মানুষ আর পশু উভয়েই শিলাবৃষ্টিকে ভয় করে, কারণ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিকি মাইল থেকে দশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত যে-কোন আকারের চাষের এলাকা একেবারে ধ্বংস হতে পারে এবং তখন ফাঁকা জায়গায় পড়লে ছেলে-মেয়ে গরু-ভেড়া নির্ঘাত প্রাণে মারা পড়বে। শিলা-বৃষ্টিতে কোন বন্য জন্তু মরতে দেখিনি বটে, কিন্তু অসংখ্য পাখির মৃতদেহ ইতস্তত ছড়ানো দেখেছি,—তাদের মধ্যে মেনাক শকুন আর ময়ূরও যে ছিল না তা নয়।

আমাদের বাড়ি ছিল তিন মাইল দূরে, কিন্তু সোজা পথ ধরে আর ঘোরানো পথগুলো কোনাকুনি পার হয়ে সে দূরত্ব আধমাইলটাক কমিয়ে আনা সম্ভব ছিল। আমার সামনে সেই এগিয়ে-আসা নীলচে-কালো মেঘ, বিদ্যুতের ঝলক সমানে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। সমস্ত জন্তু, সমস্ত পাখি এখন নীরব নিস্তব্ধ,—একমাত্র শব্দ যা শুনতে পাচ্ছি সে হল দূর থেকে বাজের গুরু-গুরু আওয়াজ। মোটা মোটা গাছগুলোর মধ্যে ঢুকতে সেই শব্দ আমার কানে এল। ঘন পাতার সামিয়ানার নিচে তখন আলো কমে এসেছে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে ছুটছি খালি পায়ে,

আর কানে শুনছি শিলাবৃষ্টি শুরু হবার আগে যে হাওয়া ওঠে তার শব্দ। বড় বড় গাছগুলোর মাঝামাঝি যেতে-না-যেতেই ঝড়টা এসে গেল, খটখটে শুকনো সমস্ত পাতা পাক খেতে খেতে উড়তে লাগল,—শব্দ হতে লাগল কোন জলের প্রবল স্রোত হঠাৎ ছাড়া পেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি। আর সেই মুহূর্তে আমার কানে এল ড্যান্‌সের বনশীর এক চিৎকার। এ যে ড্যান্‌সের বন্‌শী তাতে সন্দেহ নেই। আস্তে শুরু হয়ে তা ক্রমে অত্যন্ত ভয়াল হয়ে উঠল, তারপর ক্রমশ কমে আসতে আসতে অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মত শোনাতে লাগল। ভয়াবহ শব্দ শুনে মানুষ কখনো নিশ্চল হয়ে জমে যায়, কখনো বা অত্যন্ত কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। শব্দটার উৎপত্তি আন্দাজ করলাম আমার একটু উপরে আর পেছন দিকে, এর ফলে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আর ম্যাগগ একটা বাঘের ভয়ে প্রাণপণ দৌড় লাগিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অজানা আতঙ্কের ফলে যে মানুষ বাতাসের বেগে ছুটতে পারে এ আমার জানা ছিল না। তবু আমার স্বপক্ষে বলব যে এত ভয়েও আমি বন্দুক আর ভারি থলেটা ফেলে দৌড়ইনি। কাঁটাকুটো অগ্রাহ্য করে ছুটতে লাগলাম যতক্ষণ না বাড়ি পৌঁছলাম। মাথার উপর বাজের ভয়াল গর্জন ভেসে আসছে, আর আমি যখন বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠলাম সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে শিল পড়া শুরু হল। সবাই তখন দরজা জানলা-টানলা বন্ধ করতে ব্যস্ত, তাই আমার রুদ্ধশ্বাস অবস্থা কারুর চোখে পড়ল না।

ড্যান্‌সে বলেছিল বন্‌শী শুনলে পরিবারে বিপদ ঘটে থাকে ; তাই পাছে তেমন কোন বিপদ ঘটলে দোষটা আমার উপর পড়ে সেই ভয়ে আমি ঘটনাটা প্রকাশ করলাম না। বিপদ যে-ধরনেরই হোক তার প্রতি একটা আকর্ষণ মানুষ-মাত্রেরই থাকে, ছোট ছেলেদের পর্যন্ত। এবং যদিও এরপর বহুদিন আমি যেখানে বন্‌শী সে জায়গাটা এড়িয়ে চলেছি, একদিন ভরসা করে গেলাম সেই জঙ্গলের ধারে। সেদিনও হাওয়ার জোর ছিল। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। এমন সময় আবার সেই চিৎকার আমার কানে এল। পালাবার প্রবল ইচ্ছা অতি কষ্টে দমন করে আমি গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম, আর চিৎকারটা পর-পর কয়েকবার শোনবার পর আমি ঠিক করলাম গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে দেখব বন্‌শীর চেহারাটা। তার ডাক শুনে যখন কোন বিপদ হয় নি, তখন আমার মনে হল যে যদি সে আমায় দেখতে পায় তাহলেও নিশ্চয় খুব ছোট ছেলে বলে আমায় মেরে ফেলবে না। এই ভেবে আমি গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলাম, ভয়ে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত। ছায়ার

মত নিঃশব্দে এগোতে এগোতে শেষ পর্যন্ত ড্যান্সের বন্শী আমার চোখে পড়ল।

বহুকাল আগে কোন এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ খানিকটা উপড়ে গিয়েছিল; গাছটা পড়েই যেত যদি তার চেয়ে একটু ছোট আরেকটা গাছের উপর কোনাকুনিভাবে না পড়ত। বড় গাছটা চিরদিনের মত বেঁকে গিয়েছিল। ঝড়ের বেগে গাছটা বারবার উপরে উঠত আর ছোট গাছটার উপরে পড়ত। ফলে ঘসা লেগে লেগে দুটো গাছেরই ছাল শুকিয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আর এই ভয়ঙ্কর শব্দটা উঠেছিল এই দুটো শুকনো কাঠের ঘর্ষণের ফলেই। বন্দুক মাটিতে রেখে ঝুঁকে-পড়া গাছটা বেয়ে উঠলাম। সেখানে বসে নিচে থেকে আসা শব্দটা শুনে তবে আমি নিশ্চিত হলাম যে, জঙ্গলে ঢুকলে যে ভয় সব সময়ে আমার মনের আড়ালে থাকত তার কারন ঠিক নির্ণয় করতে পেরেছি। জঙ্গলের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে তার রহস্যের অন্তস্থলে প্রবেশ করার যে অভ্যাস পরবর্তীকালে আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল এখানেই তার সূত্রপাত বলা চলে। এবং এজন্যে ড্যান্সেকে আমার ধন্যবাদ, কারণ সে আমায় বন্শীর ভয় দেখিয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে জঙ্গলের বহুতর রোমাঞ্চকর ব্যাপারের রহস্য-উদ্ঘাটন আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

উপন্যাসের রহস্য-কাহিনী সাধারণত শুরু হয় কোন ভয়াবহ অপরাধ বা অপরাধের প্রচেষ্টা থেকে। গল্প পড়ছে এ কথা তখনকার মত ভুলে গিয়ে কৌতূহলী পাঠক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছয় যেখানে অপরাধী ধরা পড়েছে এবং শাস্তি পেয়েছে। জঙ্গলের যে রহস্য-কাহিনীর আমি উদ্ঘাটন করে এসেছি তার সূত্রপাত ঠিক এভাবে হয় না, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই যে অপরাধীর শাস্তি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিসমাপ্তি হয় তাও নয়। এমনি দুটি ঘটনা আমি আমার স্মৃতির পাঠাগার থেকে বিবৃত করছি।

(২)

আমি তখন কালাঢুঙ্গি থেকে দশ মাইল দূরে বন-বিভাগের একটা বাংলোয় তাঁবু করে রয়েছি। একদিন ভোরে আমি রান্নার জন্যে বন-মোরগ কিংবা ময়ূর যা হোক শিকার করতে বেরিয়েছি। রাস্তার বাঁ দিকে ঘন গাছে ছাওয়া একটা নিচু পাহাড়, সব রকম শিকার মেলে সেখানে; আর ডান দিকে একটা চাষের জমি। এই চাষের জমি আর রাস্তা—এর মাঝখানে ঝোপে ভরা সরু একফালি জমি। যে-সব

পাখি সকালবেলা ক্ষেতের ফসল খেতে থাকে গ্রামবাসীদের চাষের ক্ষেতে যাবার সাড়া পেয়ে তারা উড়তে উড়তে রাস্তার উপর এসে পড়ে আর গুলি করার চমৎকার সুযোগ দেয়। কিন্তু ভাগ্য সেদিন ছিল আমার প্রতি অপ্রসন্ন, কারণ যে-সব পাখি রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বন্দুকের নাগালের বাইরে ছিল তারা, ফলে চাষের ক্ষেত পার হয়ে গিয়েও আমি একবারও বন্দুক ছোড়ার সুযোগ পেলাম না।

পাখির দিকে নজর রাখতে রাখতে আমায় রাস্তার দিকেও নজর রাখতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখান থেকে আর আমার পাখি মারার সম্ভাবনা নেই, সেখান থেকে একশো গজ পর্যন্ত এসে লক্ষ্য করলাম, একটা বড় পুরুষ চিতাবাঘ আমার বাঁ দিকের পাহাড় থেকে নেমে রাস্তা পর্যন্ত এসেছে। কয়েক গজ সে রাস্তার বাঁ দিক ধরেই গিয়েছিল, তারপর রাস্তা পার হয়ে ডান দিকে এসে একটা ঝোপের কাছে শুয়ে ছিল। এখান থেকে সে আরও কুড়ি গজ পর্যন্ত গিয়ে তারপর আবার একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে ছিল। চিতাবাঘটার চলাফেরা দেখে বোঝা গেল যে সে কোন একটা ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছে, এবং সেই ব্যাপারটা যে রাস্তার উপরের কিছু নয় তা স্পষ্ট, কারণ তাহলে সে রাস্তা ধরে না গিয়ে ঝোপ ধরে ধরে যেত। সে যেখানে প্রথমে শুয়ে ছিল সেই পর্যন্ত ফিরে গিয়ে আমি হাঁটু পেতে বসে দেখবার চেষ্টা করলাম কী সে দেখছিল। চাষের ক্ষেত আর ঝোপের সরু ফালিটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, গ্রামের গরু মোষ সেখানকার ঘাস খেয়ে খেয়ে ছোট করে ফেলেছে। চিতাবাঘটা প্রথমে যে জায়গা থেকে লক্ষ্য করছিল সেখান থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় স্পষ্ট। আর দেখলাম, দ্বিতীয়বার চিতাবাঘটা যেখান থেকে দেখেছিল সেখান থেকেও এ জায়গাটা দৃশ্যমান। সুতরাং বোঝা গেল, ঢাকা জায়গাটার উপরের কোন বিশেষ জন্তুর উপরেই তার যা কিছু কৌতূহল।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে চিতাবাঘটা আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে ঝোপের অপর প্রান্তে চলে গিয়েছিল, খানিকটা জমি নিচু হয়ে রাস্তার ধার থেকে এসে এই ঢাকা জায়গাটার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ঝোপ যেখানে শেষ হয়েছে সে-পর্যন্ত এসে চিতাবাঘটা শুয়ে ছিল কিছুক্ষণ আর অনেক বার নড়া-চড়া করেছিল। তারপর সে এই নিচু জায়গাটা ধরে এগিয়ে চলেছিল, আর চলতে চলতে অনেকবার থেমেছিল আর শুয়ে বিশ্রাম করেছিল। ত্রিশ গজ এগোতে যেখানে পৌঁছলাম রাস্তা-থেকে-ধুয়ে-আসা যত বালি আর ধুলো সেখানে এসে জমা হয়েছে, আর আছে ছোট ছোট ঘাস। চিতাবাঘটা যেখানে যেখানে পা ফেলেছিল

সে সব জায়গায় ঘাসের উপর যে-সব বালি আর ধুলো পাওয়া গিয়েছিল তা থেকেই ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত যে আগের দিন শিশির পড়া শুরু হবার আগেই সে এখান দিয়ে চলে যায়, অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। ঘাস-জমিটা ছিল মাত্র কয়েক গজ পর্যন্ত বিস্তৃত, এর পর যে হালকা বালি আর ধুলো পড়ে ছিল সেখানে যখন কোন পায়ের ছাপ দেখা যায় নি তখন বোঝা যাচ্ছে যে এই পর্যন্ত এসে চিতাবাঘটা নিচু জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে। ঢাকা জায়গাটায় চিহ্ন ধরে এগোনো সম্ভব নয়, তবে, যেখানে এসে চিতাবাঘটা নিচু জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে, লক্ষ্য করে দেখলাম সেখান থেকে সে যেদিকে গেছে সেখানে এক থেকে দু-ফুট উঁচু রুক্ষ ঘাসের গুচ্ছ। সেখানে গিয়ে দেখলাম প্রায় দশ ফুট তফাত দিয়ে একটা সম্বরের খুরের গভীর ছাপ। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ গজ নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে সম্বরটার চারটে পায়ের খুরই মাটিতে গভীরভাবে বসে গেছে,—যেমনটি হতে পারে যদি সে তার পিঠের উপর থেকে হঠাৎ ঝটকা মেরে কোন কিছু ফেলে দিতে চায়। এই ত্রিশ গজ পার হয়ে সম্বরটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে সোজা ধেয়ে গেছে নিচু জায়গাটার ওপারের নিরালা একটা গাছ লক্ষ্য করে। এই গাছের গুঁড়িতে মাটি থেকে প্রায় ফুট-চারেক উপরে দেখলাম, সম্বরের লোম আর সামান্য রক্ত সেখানে লেগে রয়েছে।

আর আমার কোন সন্দেহ রইল না, বুঝলাম, সম্বরটা যে ঢাকা জায়গাটার উপর দিয়ে ধেয়ে চলেছিল, পাহাড়ের উপরে তার লক্ষ্য করার জায়গা থেকে চিতাবাঘটা দেখেছিল তা; তাই সে সুবিধে-মত জায়গায় গিয়ে চুপি-চুপি তার পিছু নিয়েছিল। তারপর সে ঘাসের গুচ্ছের আড়াল থেকে তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে এবং তার পিঠেই রয়ে যায় যতক্ষণ না সম্বরটা তাকে এমন কোন আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সে তাকে মারতে পারে এবং বিনা উপদ্রবে নিজেই সমস্ত মাংসটা খেতে পারে। যেখানে সম্বরটাকে ধরেছিল ইচ্ছে করলেই সে তাকে সেখানে মারতে পারত, কিন্তু একটা পূর্ণবয়স্ক সম্বরকে সেখান থেকে টেনে আড়ালে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত না (পায়ের ছাপ থেকে জানতে পেরেছিলাম সেটা পূর্ণবয়স্ক ছিল), ফলে দিনের আলো ফুটলে তাকে শিকারটা হারাতে হত। বুদ্ধিমানের মতই তাই সে ঠিক করেছিল যে সম্বরটার পিঠে চড়েই যাবে। প্রথম যে গাছটা পেয়েছিল সেটাতে ধাক্কা মেরে চিতাবাঘটাকে ফেলতে না পেরে এই অবাঞ্ছিত সওয়ারকে পৃষ্ঠচ্যুত করতে সম্বরটা আরও তিনবার বিফল চেষ্টা করেছিল। তারপর সে দুশো গজ গিয়ে প্রধান জঙ্গলে প্রবেশ করে, এই আশায় যে, বড় বড় গাছগুলো যা করতে পারে নি ঝোপ-জঙ্গল হয়ত তা করতে সমর্থ হবে। ঝোপের

কুড়ি গজ ভিতরে মানুষ আর শকুনের দৃষ্টির আড়ালে এসে তখন চিতাবাঘটা বুড়ো স্ত্রী-সম্বরটার গলায় দাঁত বসায়, আর দাঁত আর সামনের দুই পায়ের থাবা দিয়ে গলাটা ধরে রেখে নিজের শরীরটা এক ঝটকায় সম্বরটার উপর দিয়ে চালিয়ে দিতেই সে মাটিতে পড়ে যায়, তারপর তাকে মেরে ফেলে মাংস খেতে শুরু করে। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সে তার শিকারের কাছে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে সরে গেল সে, যদিও আমাকে তার ভয় পাবার কিছু ছিল না, কারণ আমি বেরিয়েছিলাম পাখি শিকারে, আমার সঙ্গে ছিল কেবল একটা ২৮ বোর বন্দুক, আর আট নম্বর কার্তুজ।

শিকারকে মারবার আগে তার পিঠে চড়েছে—চিতাবাঘের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি,—সে শিকার সম্বর, বা চিতল, এবং এক ক্ষেত্রে একটা ঘোড়াও হতে দেখা গেছে। কিন্তু কোন বাঘের এরকম ব্যবহারের মাত্র একটি নজিরই আমার আছে। আমি তখন কালাঢুঙ্গি থেকে বারো মাইল দূরে খাট্টা ম্যাঙ্গোলিয়া নামে একটা গোশালা অঞ্চলে তাঁবু ফেলে আছি। একদিন একটু বেলা করে প্রাতরাশ খাচ্ছি, দূর থেকে মোষের ঘণ্টার অত্যন্ত জোর শব্দ শোনা গেল। সেদিন সকালে একটা চিতাবাঘের সচল ছবি ক্যামেরায় তুলে আমি প্রায় দেড়শো মোষের একটা পালের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম,—বিস্তীর্ণ তরাই এলাকায় তারা ঘাস খেয়ে চলেছিল। এই তরাইয়ের ভিতর দিয়ে বালি-ভরা একটা নালা চলে গেছে, সামান্য জল তাতে ঝকমক করছে। এই নালায় একটা বাঘ আর একটা বাঘিনীর টাটকা পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়ল। ঘণ্টা যে রকম জোরে জোরে বাজছে তাতে বুঝলাম যে মোষের পালটা ঊর্ধ্বশ্বাসে গো-শালার দিকে ছুটেছে। ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে একটা মোষের ডাকও মিশেছিল। গোশালায় মানুষ ছিল জন-দশেক, এই ব্যাপারে ভয় পেয়ে তারা চিৎকার করতে লাগল আর ক্যানেস্তারা বাজাতে শুরু করল। এর ফলে মোষের পালটা চিৎকার বন্ধ করল বটে, কিন্তু ঘরে না পৌঁছনো পর্যন্ত তাদের দৌড় থামল না।

কিছুক্ষণ পরে সমস্ত হট্টগোল থেমে যেতে দুটো গুলির শব্দ আমার কানে এল। গোশালায় খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর কয়েকজন ভারতীয় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে; তাদের মাঝখানে একটা মোষ মাটিতে পড়ে রয়েছে। ইউরোপীয়টির কাছে শুনলাম ব্যাপারটা। তিনি ইজ্জতনগরের ইণ্ডিয়ান উড প্রোডাক্‌স্‌ কর্তৃক নিযুক্ত। তিনি যখন রাখালদের সঙ্গে কথা কইছিলেন এমন সময় দূর থেকে মোষগুলোর ঘণ্টার শব্দ তাঁদের কানে আসে। দলটা কাছে আসতে তাঁরা শুনতে পেলেন

একটা মোষ চিৎকার করছে, আর সেইসঙ্গে একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনও তাঁদের কানে এল। আমি ছিলাম আরও খানিকটা দূরে, বাঘের গর্জনটা আমার কানে আসে নি। বাঘটা গোশালার দিকে আসছে মনে করে রাখালটা খুব চেঁচামেচি শুরু করে আর ক্যানেস্তারা বাজাতে থাকে। মোষের পালটা যখন ফিরল, দেখা গেল একটা মোষের সারা গায়ে রক্ত মাখা আর রাখালরা যখন বলল যে তার আর বাঁচার কোন আশা নেই, তাদের অনুমতি নিয়ে তখন তিনি তাকে গুলি করেন। মাথায় দুটো গুলি খেয়ে তার যন্ত্রণার অবসান হয়।

মোষটা ছিল অল্পবয়স্ক, ভারি চমৎকার তার স্বাস্থ্য; রাখালরা যে বলেছিল সে হল পালের একটা সেরা মোষ, কথাটা বিশ্বাস করবার মত। এহেন অবস্থায় কোন জন্তু আমি কখনো দেখিনি, তাই আমি তাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলাম।

মোষটার ঘাড়ে আর গলায় কোন দাঁতের বা থাবার চিহ্ন নেই, কিন্তু তার পিঠে পঞ্চাশটা বা তারও বেশি গভীর ক্ষত,—বাঘের থাবায় এ ক্ষত হয়েছে। কয়েকটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে বাঘটা যখন মোষটার মাথার দিকে মুখ করে ছিল, আর কয়েকটার সৃষ্টি হয়েছে বাঘটা যখন মোষটার ল্যাজের দিকে মুখ করে ছিল। তাঁবুতে ফিরে আমি একটা ভারি রাইফেল নিয়ে মোষটার চিহ্ন লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম। দেখলাম মোষগুলো দৌড়তে শুরু করেছিল, নালার ওপারে যেখানে আমি বাঘটার পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেছিলাম সেখান থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানকার ঘাস মানুষের কাঁধ পর্যন্ত হওয়ায় আর সে দৃশ্য সঠিক আন্দাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না, এবং এমন কোন সূত্রও মিলল না যা থেকে আন্দাজ করতে পারি কী করে বাঘটা এই মোষটার পথে এসে পড়েছিল যাকে সে মারতে চায় নি। মারতে যে চায় নি এ বোঝা যায় মোষটার ঘাড়ে আর গলায় রক্তচিহ্নের অভাব থেকে। দৃশ্যটা সঠিক আন্দাজ করতে না পারার জন্যে অত্যন্ত আফশোস হল, কারণ শুধু যে এই একটা ব্যাপারেই আমার ভুল হয়েছিল তাই নয়, বাঘের পক্ষে কোন জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হওয়ার আর সেইসঙ্গে সেই সওয়ারের মাংস খাওয়া এ ছাড়া আর কোন নজির শোনা যায় নি।

নালার পায়ের দাগগুলো থেকে বোঝা যায় যে দুটো বাঘই ছিল পূর্ণদেহ, সুতরাং অল্পবয়স্ক বাঘের অনভিজ্ঞতার যুক্তিও এখানে খাটে না। তা ছাড়া অল্পবয়স্ক কোন বাঘ বেলা দশটার সময়—বলতে কি, কোন সময়েই একপাল মোষের সম্মুখীন হতে সাহস করবে না।

আমার পুরনো বন্ধু হ্যারি গিল-এর ছেলে এভেলীন গিল-এর মত প্রজাপতি-সংগ্রাহক আমি অতি অল্পই দেখেছি। ক-দিনের ছুটি নিয়ে যখন সে নৈনিতালে এসেছিল তখন একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম পাওয়ালগড় রোডে একটা প্রজাপতি আমি দেখেছি, তার উপরের ডানাগুলোয় লাল লাল চমৎকার ফোঁটা কাটা। এভেলীন বললে এ ধরনের প্রজাপতি সে কখনো দেখেনি, তাই সে আমায় অনুরোধ করল তাকে একটা নমুনা জোগাড় করে দিতে।

এর কয়েক মাস পরে একদিন আমি পাওয়ালগড় থেকে তিন মাইল দূরবর্তী সাঁদনি গাগায় তাঁবু করে বাস করছিলাম, উদ্দেশ্য—চিতল হরিণদের লড়াইয়ের সচল ছবি তুলে নেওয়া, কারণ এ অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী চিতল হরিণরা দৃশ্য দুর্লভ-দর্শন ছিল না। একদিন সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমি প্রতিশ্রুত প্রজাপতি ধরবার জন্যে প্রজাপতি-ধরা জালটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তাঁবু থেকে একশো গজ দূরে একটা বনপথ আছে. কালাঢুঙ্গি আর পাওয়ালগড়ের মধ্যে সেটা যোগসূত্রের কাজ করে। এই রাস্তার মাইল-খানেক দূরে একটা গর্তে ছিল সম্বরদের আড্ডা, আশা ছিল এখানে আমার সেই প্রজাপতি মিলবে।

এই বনপথে মানুষের চলাচল বিশেষ ছিল না, এবং যে বনের ভিতর দিয়ে এই পথ চলে গেছে সেখানে শিকার পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় ভোরবেলা এ পথে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রচুর কৌতূহল ছিল। শক্ত মাটির এই পথের ধুলোর হালকা প্রলেপের উপর যত প্রাণী আগের রাতে চলাফেরা করেছে তাদের সকলেরই চিহ্ন এখনো রয়েছে। রাস্তা বা জন্তুর পায়ে-চলা পথে চলতে চলতে অভিজ্ঞ মানুষকে চলে-যাওয়া প্রাণীর জাতি বা গতিবিধি ইত্যাদি আন্দাজ করার জন্যে বার-বার থামতে হয় না—কারণ তার অবচেতন মনে এসব খুঁটিনাটি স্বতই ফুটে ওঠে। যেমন ধরা যাক, সেই শজারুটা। আমি যেখানে এসে রাস্তায় পড়েছি তার একটু দূরে যেটা রাস্তায় এসে উঠেছিল। স্পষ্টই বোঝা যায়, কোন কিছু থেকে ভয় পেয়ে সে রাস্তার ডানদিকের জঙ্গল থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তার এই আতঙ্কের কারণও বোঝা গেল কয়েক গজ এগিয়ে যেতেই—একটা ভাল্লুক সেখানে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে রাস্তা অতিক্রম করে এসেছিল। বাঁ দিক দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে ভাল্লুকটা একপাল শুয়োর আর চিতলের একটা ছোটখাট দলকে চমকে দিয়েছিল,—সবেগে তারা রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের জঙ্গলে প্রবেশ করে। আর একটু আগে একটা সম্বর হরিণ ডান দিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং একটা ঝোপের মধ্যে খানিকক্ষণ খাওয়ার পর পঞ্চাশ

গজের মত রাস্তা ধরে চলেছিল, তারপর তার শিংগুলো একটা ছোট চারা গাছে খানিকক্ষণ ঘসার পর আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। এরই কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা চৌশিঙা কৃষ্ণসার একটা বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় এসেছিল। হরিণ-শিশুটার পায়ের ছাপ কোন শিশুর হাতের নখের চেয়ে বড় হবে না। বাচ্চাটা রাস্তার উপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু তার পরেই তার মা ভয় পেয়ে যায়, এবং রাস্তা ধরে কয়েক গজ সবেগে ছুটে গিয়ে মা আর সন্তান জঙ্গলে প্রবেশ করে। এখানে রাস্তায় একটা বাঁক ছিল, এই বাঁকের উপর ছিল একটা হায়েনার পায়ের ছাপ। হায়েনাটা এসেছিল এই পর্যন্ত, তারপর যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে ফিরে যায়।

পথের চিহ্ন লক্ষ্য করে করে আর পাখির গান শুনে-শুনে (সাঁদনি গাগা শুধু যে এখানে একশো মাইলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা তাই নয়, তার পক্ষীকুলের জন্যেও সে বিখ্যাত) আধ-মাইলটাক অগ্রসর হবার পর পাহাড় কেটে তৈরি একটা রাস্তার উপর এসে পৌছলাম। এখানকার শক্ত মাটিতে পায়ের চিহ্ন দেখা যায় না। আরও খানিকটা সেই পথ ধরে যাবার পর একটা অস্বাভাবিক চিহ্ন লক্ষ্য করে থমকে দাঁড়ালাম। যেখানে ঐ চিহ্নটার শুরু সেখানে ছিল তিন ইঞ্চি লম্বা আর দু-ইঞ্চি গভীর একটা লাঙল-চষার মত রেখা,—সেটা চলে গিয়েছিল সমকোণে রাস্তাটা কেটে। লোহার মাথাওয়ালা কোন বস্তু দিয়েই হয়ত এটা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন মানুষ এ পথে যায় নি। অথচ এ দাগের সৃষ্টি হয়েছে গত বারো ঘণ্টার মধ্যে। তা ছাড়া, এ যদি মানুষের কাজ হত তাহলে এ দাগ চলত রাস্তার সমান্তরালে, সমকোণে নয়। রাস্তাটা এখানে চোদ্দ ফুট চওড়া আর তার ডানদিকটা যেমন প্রায় খাড়াই আর দশ ফুট উঁচু, বাঁ দিকটা তেমনি সিধে গভীর হয়ে নেমে গেছে। সেখান থেকে বোঝা যায়, যে বস্তু দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে সেটা গেছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।

এটা মানুষের তৈরি নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পরে আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলাম যে একমাত্র কোন পশুর শিঙের সূঁচলো আগা দিয়েই এ তৈরি হওয়া সম্ভব,—কোন চিতল হরিণের বা কৃষ্ণসারের বাচ্চারই হবে। রাস্তার উঁচু পাড় থেকে যদি সে লাফিয়ে পড়ত তাহলে তার খুরে রাস্তার উপর নিশ্চয় ভাঙার চিহ্ন মিলত, যত খারাপভাবেই লাফিয়ে পড়ুক সে; কিন্তু এই রেখার ধারে-কাছে কোথাও হরিণের কোন চিহ্ন ছিল না। এই রেখাটাকেই আমার একমাত্র সূত্র ধরে আমি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে এ হল কোন মরা হরিণের শিঙের কীর্তি,—এর সৃষ্টি হয়েছে কোন বাঘ যখন হরিণ মুখে করে পাড়

থেকে লাফিয়ে পড়েছে। রাস্তার উপর যে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন নেই স একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কারণ বাঘ বা চিতাবাঘ কোন শিকার নিয়ে রাস্তা পার হবার সময় যখনই সম্ভব হয় সেটাকে শূন্যে ধরে রাখে: এর কারণ, আমার ধারণা, যাতে ভাল্লুক বা হায়েনা বা শেয়াল চিহ্ন অনুসরণ করে পিছু না ধরতে পারে।

এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে আমি রাস্তা পার হয়ে রাস্তার বাঁ দিকের পাহাড়টায় দৃষ্টিপাত করলাম। কোন জন্তুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখা গেল না। তবে, পাহাড়ের কুড়ি ফুট দূরে আর প্রায় চার ফুট উঁচুতে একটা ঝোপে গাছের পাতায় প্রাতঃসূর্যের আলোয় কি একটা ঝলমল করছে দেখা গেল। ভাল করে দেখব বলে সেখানে নেমে গিয়ে দেখলাম, এ হল রক্তের একটা বিন্দু, এখনও একেবারে শুকিয়ে যায় নি। এখান থেকে চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয় নি, এবং পঞ্চাশ গজ মত অগ্রসর হয়ে একটা ছোট গাছের নিচে চারদিকের ঘন ঝোপের মধ্যে আমি শিকারটা দেখতে পেলাম। এ হল একটা চিতল হরিণ,—তার মাথার শিংগুলো অনেক শিকারীর কাছেই স্মারক হিসেবে বহুমূল্য মনে হবে। শিকার নিয়ে বাঘটা কোন ঝুঁকি নেয় নি—তার পিছনের দুটো পা-ই বাঘটা খেয়ে ফেলেছে, আর যাতে কোন পাখি বা পশু তার সন্ধান না পায় সেজন্যে সে বেশ খানিকটা জায়গা থেকে কাঠি-কুটি আর শুকনো পাতা জড়ো করে এনে তার শিকারের উপর চাপা দিয়েছে। কোন বাঘ যখন এমনটি করে থাকে তখন বুঝতে হবে যে সে ধারে-কাছে কোথাও থেকে শিকারের উপর লক্ষ্য রাখছে না।

ফ্রেড অ্যাণ্ডারসন আর হুইশ্ এডি-র কাছে আমি এই এলাকার একটা বড় বাঘের কথা শুনেছি, শ্রীমতী (অধুনা লেডি) অ্যাণ্ডারসন যার নাম দিয়েছিলেন, 'পাওয়ালগড়ের কুমার'। বহুদিন থেকেই আমার এই বিখ্যাত বাঘটাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল, এ প্রদেশের সমস্ত শিকারী যাকে মারবার চেষ্টা করছে। যে সম্বরের আড্ডার দিকে আমি যাচ্ছি, আমি জানতাম সে থাকত সেখান থেকে যে গভীর দরিপথের শুরু হয়েছে সেখানে। যে বাঘ চিতলটাকে মেরেছে তাকে সনাক্ত করতে পারি এমন কোন পায়ের ছাপ মড়ির কাছে না থাকায় আমার মনে হল মড়িটা হয়ত 'কুমারে'র সম্পত্তি, এবং তা যদি হয় তাহলে তার দর্শন পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে,—দেখতে পাব যেমনটি শুনেছি সত্যি সে ঠিক ততটা বড় কি না।

মড়ির কাছ থেকে একটা সরু ফাঁকা জায়গা একশো গজ দূরের একটা ছোট

ঝরনা পর্যন্ত চলে গেছে। এই ঝরনার ওপারে বুনো লেবু গাছের ঘন জঙ্গল। 'কুমাব' যদি তার ডেরায় না ফিরে থাকে খুব সম্ভব তাহলে সে এই ঘন ঝোপে ভরা জায়গাটার মধ্যেই আছে; তাই আমি ঠিক করলাম বাঘটার মড়িতে ফেরার অপেক্ষায় থাকব। এই সিদ্ধান্তে এসে আমি রাস্তার দিকে অগ্রসর হলাম, প্রজাপতি-ধরা সাদা রঙের জালটা কতকগুলো শুকনো পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখে। ফাঁকা জায়গাটার উপরের দিকটা প্রায় দশ ফুট চওড়া, যে গাছটার নিচে মড়িটা পড়ে ছিল ফাঁকা জায়গাটার ডান দিকে সেটারও প্রায় সেইরকম দুরত্ব। ফাঁকা জায়গাটার বাঁ দিকে, আর মড়িটার প্রায় বিপরীত দিকে ছিল লতা ছাদ দেওয়া একটা গাছের মরা কঙ্কাল। প্রথমে নিঃসন্দেহ হলাম যে মরা গাছের গুঁড়িটায় সাপের ডেরার মত কোন গর্ত নেই, তারপর সেখান থেকে সমস্ত শুকনো পাতা সরিয়ে ফেললাম, পাছে কোন বিছের উপর বসে পড়ি। তখন সেই গুঁড়ির উপর পিঠ দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরের মড়িটা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি ফাঁকা জায়গাটাও ঝরনা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই ঝরনার অপর পারে একপাল বানর একটা পিপল গাছের ফল খেয়ে চলেছে।

প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হতে আমি তখন চিতাবাঘের ডাক ডেকে উঠলাম। চিতাবাঘরা নিরাপদ মনে করলে বাঘের মড়ি খেয়ে থাকে, এবং বাঘেরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তাই বাঘটা যদি আমার এই ডাক শুনতে পেয়ে থাকে আর আমার অনুকরণ যদি তেমন ভাল হয়ে থাকে তাহলে হয়ত সে এদিকে এগিয়ে আসবে। তখন তাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জানিয়ে দেব যে আমি এখানে আছি। ভয়-পাওয়া ডাক ডেকে বানররা আমার ডাকের সাড়া দিল, আর তিনটে বানর একটা পিপল গাছের একটা ডালের উপর এসে বসল। ডালটা মাটি থেকে ৪০ ফুট উঁচুতে,—গাছ থেকে প্রায় সমকোণ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বানরগুলো আমায় দেখতে পায় নি, তাতে ভালই হল, তাদের এই ভয়-পাওয়া ডাকটা এক মিনিটের বেশি চলেনি; কারণ বাঘটা যদি কাছাকাছি কোথাও থেকে থাকে তাহলে এই ধারণাই তার বদ্ধমূল হবে যে কোন চিতাবাঘ তার মড়িতে হস্তক্ষেপ করছে। বানর তিনটির উপর লক্ষ্য রেখে চলেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা বানর মুখ ফিরিয়ে তার পেছন দিকে উঁকি মারল, তারপর পর-পর ক-বার মাথাটা তুলে আর নামিয়ে ভয়-পাওয়া ডাক ডেকে উঠল। মিনিট-খানেকের মধ্যেই বাকি দুটো বানরও ডাকতে শুরু করল আর তারপরেই গাছের অনেক উঁচু থেকে আরও অনেক বানর সে ডাকে যোগ দিল। বুঝলাম বাঘটা আসছে। ক্যামেরাটা না আনার জন্যে খুব দুঃখ হল; চমৎকার উঠত ছবিটা—

ফাঁকা জায়গার উপর দিয়ে বাঘটার এই এগিয়ে আসা। নদীর জলে রোদ পড়ে ঝলমল করে উঠছে; আর উত্তেজিত বানরগুলোকে নিয়ে পিপল গাছটা চমৎকার পশ্চাৎপটের সৃষ্টি করেছে।

এহেন অবস্থায় যেমনটি হয়ে থাকে তাই হল। আমি যা আশা করেছিলাম বাঘটা করল না তা। অনেকক্ষণ নীরবে কাটল, এই সময়ে এই অস্বস্তিকর ভাবটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল যে বাঘটা তার মড়ির দিকে আসছে আমার পেছন দিক থেকে। এক ঝলকের মত বাঘটা আমার চোখে পড়ল—দেখলাম, এক লাফে ঝরনাটা পার হয়ে সে ফাঁকা জায়গাটার ডান দিকের ঘন ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হল। বুঝলাম ঝরনার ওপারের ঝোপের আড়ালে সুবিধে-মত জায়গা দেখে নিয়ে বাঘটা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলে চিতাবাঘটা দেখতে পাবে তাকে। তাই সে তখন এমনভাবে মড়ির দিকে অগ্রসর হল যাতে সে চিতাবাঘটার দেখা পেতে পারে। অবশ্য আমার তরফ থেকে এতে অসুবিধের কিছু ছিল না, যদিও এতে করে, আমি যতটা চাই তার চেয়ে সে একটু বেশিই আমার কাছে এসে পৌছবে।

মাটিতে শুকনো পাতার কার্পেট পাতা, অথচ বাঘটা এমন নিঃশব্দে অগ্রসর হল যে কোন শব্দই আমার কানে আসে নি। এর পর যখন আমি তাকে দেখি সে তখন তার মড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হল দেখে যে, যে কুমারের সন্ধানে আমি এসেছি এ বাঘ সে নয়, এ হল একটা বড় বাঘিনী। মেজাজ তার যখন খুব ভাল তখনও বাঘিনীর উপর ভরসা করা চলে না, এবং এখন তার মেজাজ সবচেয়ে ভাল যাকে বলে তা নয়, কারণ আমি তার মড়ির এত কাছে আছি। এ থেকে আমি অস্বস্তি বোধ করছি, আর তা ছাড়াও এমন হতে পারে যে নিচু ঝোপটার আড়ালে তার বাচ্চারা রয়েছে, এবং সে ক্ষেত্রে তার মড়ির কাছে আমার উপস্থিতি তার পক্ষে বিরক্তিজনক হবার সম্ভাবনা। যাই হোক যে-পথে সে এসেছে যদি সে-পথে ফিরে যায় তো কোন হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু বাঘিনী তা করল না। চিতাবাঘ তার মড়ি স্পর্শ করে নি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাঘিনী ফাঁকা জায়গাটার দিকে অগ্রসর হল। এতে করে তার মড়ির আর আমার মধ্যকার দূরত্বটা অর্ধেক হয়ে গেল। দীর্ঘ এক মিনিট কাল বাঘিনী কিংকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,—আমি তখন দম বন্ধ করে আছি, আমার চোখ ছোট হতে হতে সরু একটা রেখার মত হয়ে উঠেছে, এমন সময় দেখলাম বাঘিনী ধীরে ধীরে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে নেমে গেল, ঝরনার ধারে এসে একটু জল খেল, তারপর ঘন ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হল।

এই দুই ক্ষেত্রেই আমি প্রথমে জানতে পারি নি যে কোন হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়েছে। কোন্ ছোট সূত্র যে কোথায় নিয়ে যাবে এ বিষয়ে এই অনিশ্চয়তার ফলেই জঙ্গলের রহস্য-কাহিনী এত চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রহস্য-কাহিনী রচনা অতি অল্প লোকেই করতে পারে। কিন্তু জঙ্গলের রহস্য কাহিনী রচনা করা সকলের পক্ষেই সম্ভব, যদি চলার পথে তাদের দৃষ্টি আরও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে আর যদি তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজে না নামে যে তারা সমস্ত কিছু জেনে ফেলেছে, আসলে যখন আদৌ কিছুই শেখেনি।

৯

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমাকে নৈনিতাল ভলান্টিয়ার রাইফেলের স্কুল ক্যাডেট কোম্পানিতে যোগদানের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হল। স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সে সময়ে ছেলেদের প্রচুর উৎসাহ ছিল এবং এতে প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হত। সুস্থদেহ যত ছেলে আর যত মানুষ সবাই প্রচুর গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে এতে যোগ দিত। আমাদের বাহিনীতে ছিল চারটি ক্যাডেট দল আর পূর্ণবয়স্কদের একটি দল; বাহিনীর সভ্যসংখ্যা ছিল মোট ৫০০। মোট জনসংখ্যা যেখানে ৬,০০০ সেখানে এই সংখ্যার অর্থ এই হল যে, প্রতি বারো জনের মধ্যে একজন করে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক।

আমাদের স্কুলে ছিল সত্তরটি ছেলে। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন আবার স্কুলের ক্যাডেট দলের ক্যাপ্টেনও। দলে ক্যাডেট ছিল পঞ্চাশ জন। এই প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সৈন্যবাহিনীর লোক, তাঁর প্রাণে এই মহৎ বাসনাই সর্বদা জ্বলজ্বল করত যে তাঁর ক্যাডেটই যেন সমস্ত বাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্যে আমাদের খাটতে হত—প্রচুর খাটতে হত। সপ্তাহে দু-দিন স্কুলের মাঠে, আর একদিন অন্য চারটি দলের সঙ্গে নৈনিতাল হ্রদের উচ্চ প্রান্তের উপর দিকের ফাঁকা জায়গাটায় আমাদের ড্রিল হত।

আমাদের ক্যাপ্টেনের চোখে কোন ভুল এড়িয়ে যেত না এবং ড্রিলের সময়কার সমস্ত ভুলের খেসারত দিতে হত স্কুলের ছুটির পরে। টার্গেট থেকে চার ফুট তফাতে চার ফুট লম্বা একটা বেত হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন ক্যাপ্টেন। তিনি ছিলেন নিশানায় ওস্তাদ; তাঁর নাম হয়েছিল—অব্যর্থলক্ষ্য ডিক। নিজের সঙ্গে তিনি কোন বাজি ধরতেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা ছোটরা মার্বেল, লাট্টু, পেন্সিল-কাটা ছুরি, এমনকি আমাদের প্রাতরাশের বিস্কুট পর্যন্ত

বাজি রাখতাম যে দশ বারের মধ্যে ন-বারই তিনি, গত দিনে বা গত সপ্তাহে ঠিক যেখানে বেত মেরে সবচেয়ে বেশি ব্যথার সৃষ্টি করেছিলেন অবিকল সেই জায়গাটায় বেত মারবেন। বাজি যে ধরত,—নতুন-আসা কোন ছেলেই এ বাজি ধরত সাধারণত—প্রতিবারই হারত সে। অন্যান্য ক্যাডেট দলগুলি কিছুতেই আমাদের দলের ড্রিলকে সবচেয়ে সেরা বলে মানতে চাইত না, যদিও এ তারা মানত যে চেহারায় ও সাজ-পোশাকে আমরা ছিলাম সবচেয়ে সেরা; কারণ ড্রিলে যোগ দেবার আগে অন্যান্য ক্যাডেটদের সঙ্গে আমাদের পোশাক আর চেহারা খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হত,—নখের ভিতরে সামান্যমাত্র ময়লা, বা পোশাকে এতটুকু ধুলোর আভাসও চোখ এড়াত না।

আমাদের ইউনিফর্ম (ছোট হয়ে গেলে আমরা যা ছোটদের দিয়ে দিতাম) ছিল ঘোর নীল সার্জের,—যেমন প্রচুর লম্ফ-ঝম্প সহ্য করার ব্যাপারে, তেমনি শরীরের যে-কোন কোমল অংশ ছড়ে দেবার ব্যাপারে ছিল তার গ্যারান্টি। ধুলোর সামান্য কণাটুকু পর্যন্ত সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠত। তবে, যতই গরম আর অস্বস্তিকর হোক সে ইউনিফর্ম, যে হেলমেট আমাদের সেইসঙ্গে পরতে হত, অস্বস্তির ব্যাপারে তার তুলনায় এ কিছুই নয়। ভারি নিরেট খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি যন্ত্রণার এই যন্ত্রটায় থাকত একটা করে চার ইঞ্চি লম্বা কাঁটা, তার ভোঁতা দিকটার এক ইঞ্চি বা তারও বেশি হেলমেটের ভিতরে ঢুকে যেত, যেজন্যে হেলমেটের ভিতরটা কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। তারপর হেলমেটটা মোক্ষমভাবে মাথায় আঁকড়ে বসলে তখন একটা খুব ভারি, শক্ত চামড়ার মোড়া স্ট্র্যাপ দিয়ে সেই থুতনির সঙ্গে এঁটে দেওয়া হত। প্রচণ্ড রোদে তিন ঘণ্টা কাটাবার পর আমাদের সকলেরই ভয়ঙ্কর মাথা ধরত। ফলে গত রাতের পাঠের পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠত, এবং ফলে অন্য যে-কোন দিনের থেকে ড্রিলের দিনে মুক্ত হাতে বেতের ব্যবহার হত।

ড্রিলের দিনে কখনও-কখনও কোন উচ্চপদস্থ ইনস্পেকটর বাইরে থেকে আমাদের পরিদর্শনে আসতেন। এক ঘণ্টা ধরে বন্দুক নিয়ে ড্রিল এবং তার পুনরাবৃত্তির পর আমাদের মার্চ করতে করতে শুকা টাল (বা শুকনো হ্রদ) রাইফেল রেঞ্জের কাছে নিয়ে যাওয়া হত। এখানে পৌঁছলে ক্যাডেটদের বলা হত পাহাড়ের গায়ে বসে পড়তে, আর আগন্তুক অফিসারদের কাছে তাদের ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিতে। এই বাহিনীর গর্ব ছিল যে ৪৫০ মার্টিন রাইফেলে ভারতের সেরা লক্ষ্যভেদী তাদের মধ্যে আছে এবং এই গর্ব বাহিনীর প্রত্যেকের মধ্যে প্রকাশ পেত। যে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে তা ছিল ভারি, লোহার তৈরি;

একটা পাকা বাঁধানো উঁচু পাটাতনের উপর রাখা হত সেটা। সেই লক্ষ্যে গুলি লাগলে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারত সেটা ঠিক মাঝখানে লেগেছে না এক পাশে।

প্রত্যেক ক্যাডেট দলেরই বড়দের মধ্যে একজন করে উপাস্য বীর ছিল, এবং এ-হেন কোন বীর যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হত তাহলে তা নিয়ে রক্তাক্ত লড়াই পর্যন্ত হতে পারত যদি ইউনিফর্ম পরে লড়াই করা নিষিদ্ধ না হত। যাদের লক্ষ্য সবচেয়ে ভাল হয়েছে তাদের ফলাফল ঘোষিত হবার পর ক্যাডেটদের উপর হুকুম হত পাঁচশো থেকে দুশো রেঞ্জ সীমারেখা পর্যন্ত মার্চ করতে। সেখানে এসে প্রতিটি দল থেকে চার জন করে বড় ক্যাডেট বেছে নেওয়া হত, আর আমরা যারা ছোট তাদের উপর হুকুম হত, অস্ত্র-শস্ত্র সাজিয়ে যেখান থেকে গুলি ছোড়া হবে তার পেছনে থাকতে হবে।

আন্তঃ-স্কুল প্রতিযোগিতা যে-কোন খেলায়, বিশেষ করে এই বন্দুকের ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং সেই বিশেষ দিনে এই চার জন প্রতিনিধির লক্ষ্যভেদ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা হত এবং বন্ধু শত্রু নির্বিশেষে তার তীব্র সমালোচনা হত। গুলিগুলো সব খুব কাছাকাছিই গিয়ে পড়ত, কারণ প্রত্যেকটি দলের যারা সেরা কেবলমাত্র তাদেরই বেছে নেওয়া হত। খেলার শেষে ঘোষণা করা হল যে আমাদের দল দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে, এবং এক পয়েন্টে আমরা হেরেছি এমন এক স্কুলের কাছে যার ছাত্রসংখ্যা হবে আমাদের তিনগুণের মত।

যে প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তার ফলাফল নিয়ে আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করছি, এমন সময় দেখা গেল সার্জেন্ট মেজর কর্মকর্তাদের দল থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন; তারপর এক মাইল দূর থেকে শোনা যায় এমন চিৎকার করে তিনি হেঁকে উঠলেন,—'করবেট! ক্যাডেট করবেট!' হা ভগবান! আবার কী দোষ করলাম যে-জন্যে শাস্তি পেতে হবে! বলেছিলাম বটে যে শেষ যে গুলিটায় প্রতিপক্ষেরা আমাদের এক পয়েন্টে হারিয়ে দেয় সেটা নেহাত আন্দাজে হয়ে গেছে এবং তা শুনে একজন আমার সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিল, কিন্তু লড়াইটা হয় নি, এবং লড়াই করতে যে চেয়েছিল তাকে আমি চোখেও দেখিনি পর্যন্ত। সার্জেন্ট মেজর আবার তেমনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'করবেট, ক্যাডেট করবেট!' 'যাও যাও, ডাকছেন তোমাকে'; 'তাড়াতাড়ি কর, নইলে বিপদে পড়বে'—চারদিক থেকে এইসব মন্তব্য আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত খুব ক্ষীণ গলায় আমি উত্তর দিলাম, 'ইয়েস, স্যর!' 'এতক্ষণ উত্তর দাও নি কেন? তোমার

'কার্বাইন কোথায়? যাও নিয়ে এস এক্ষুনি!' এক নিশ্বাসে এইসব উক্তি আমার উপর বর্ষিত হল। এতগুলো হুকুমে আমার তখন মাথা ঘুরে গেছে, ভেবে পাচ্ছি না কী করব,—এমন সময় পেছন থেকে এক বন্ধু ঠেলা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বললে, 'যাও না, কী বোকা তুমি!' তখন আমি আমার কার্বাইন আনতে ছুটলাম।

যেখান থেকে লক্ষ্য দুশো গজ সেখানে পৌছলাম। আমাদের মধ্যে যারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছিল না তাদের উপর অস্ত্রশস্ত্র স্তূপীকৃত রাখার হুকুম ছিল। তেমনি একটা পাইল ছিল আমার কার্বাইনটা দিয়ে আঁটা। এখন আমার কার্বাইনটা ওখান থেকে বের করে নিতে যেতেই সমস্ত স্তূপটা ছড়িয়ে পড়ল। সেগুলো গুছিয়ে রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় সার্জেণ্ট মেজর চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ছেড়ে দাও ওগুলো—এস তোমারটা নিয়ে এখানে!' এর পরের হুকুম হল, 'শোল্ডার আর্ম্‌স্‌, রাইট টার্ন, কুইক মার্চ!' আমাকে গুলি করবার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। এমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম যে তা আর বলবার নয়। সার্জেণ্ট মেজর ফিস-ফিস করে বললেন, 'খবর্দার, আমার মাথা যেন হেঁট না হয়!'

সেখানে পৌঁছতে আগন্তুক অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন আমিই আমাদের ক্যাডেটদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক কি না এবং যখন শুনলেন হ্যাঁ, বললেন তিনি আমার কয়েকটা গুলি ছোড়া দেখতে চান। সস্নেহ হাসির সঙ্গে যেভাবে তিনি এ-কথা বললেন তাতে আমার মনে হল যে যত কর্তা-ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে একমাত্র এই ভদ্রলোকই বুঝতে পেরেছিলেন আমি কত অসহায়—কোন ছোট ছেলের পক্ষে বড় বড় গুণীজন-সম্মেলনে গুণপনার পরিচয় দিতে যাওয়া কত দুরূহ!

যে ৪৫০ মার্টিনি কার্বাইন ক্যাডেটদের দেওয়া হত, বন্দুক ছুড়তে গেলে তা থেকে যে ভয়ঙ্কর ধাক্কা আসে তা যে-কোন ছোট বন্দুকের থেকে বেশি। তার উপর সম্প্রতি শিক্ষাকালে আমার বাঁ কাঁধে অত্যন্ত ব্যথা হয়েছিল—বিশেষ মাংস তো আমার কাঁধে ছিল না! সেই কাঁধে আবার ব্যথা লাগবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে আমি আরও নার্ভাস হয়ে পড়লাম। যাই হোক পরীক্ষা আমায় দিতেই হবে,—ক্যাডেটদের মধ্যে যখন আমিই সবচেয়ে ছোট। যে পাঁচটা গুলি আমার জন্যে ছিল সার্জেণ্ট মেজরের আজ্ঞায় আমি নুয়ে পড়ে তাদের একটা তুলে নিলাম, কার্বাইনে ভরলাম, তারপর খুব আস্তে আস্তে সেটা কাঁধে তুলে যথারীতি লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলাম। কিন্তু লক্ষ্যভেদের কোন শ্রবণরঞ্জন শব্দ লোহার লক্ষ্যস্থল থেকে এল না, কেবল একটা

নিস্তেজ শব্দ শোনা গেল আর একটা শান্ত স্বর আমার কানে এল : 'ঠিক আছে, সার্জেন্ট-মেজর, আমি দেখছি এবার।' এই বলে আগন্তুক অফিসার—ঝকঝকে তাঁর পোশাক—আমার পাশে এসে তেল-চিটচিটে শতরঞ্চির উপর শুলেন। বললেন, 'দেখি তোমার কার্বাইনটা কেমন ?' সেটা দিতে তিনি হাতে ধরে, খুব সাবধানে ব্যাক-সাইটটা দু'শো গজ দূরত্বে লাগালেন—এটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর কার্বাইনটা আমার হাতে দিয়ে আদেশ করলেন যেন তাড়াহুড়ো না করে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করি। এখন যে চারটে গুলি করলাম সেগুলো প্রত্যেকটাই লক্ষ্যভেদ করল। আমার পিঠ চাবড়ে দিয়ে আগন্তুক অফিসার উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার ফলাফল জিজ্ঞাসা করায় যখন বললাম যে মোট কুড়ি পয়েণ্টের মধ্যে আমার হয়েছে দশ, আর প্রথম গুলিটা ফস্কে গেছে, তিনি বললেন, 'চমৎকার ! খাসা হয়েছে !' অন্যান্য অফিসার আর শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে গেলেন, আর আমিও ফিরে গেলাম আমার সঙ্গীদের মধ্যে—গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ছে না। কিন্তু আমার এ গর্ব দীর্ঘস্থায়ী হল না, কারণ আমার অভ্যর্থনার ভাষা হল এইরকম : 'জঘন্য।' 'সমস্ত দলটার মুখে কালি দিয়েছে।' 'চোখ বুজেও এর চেয়ে ভাল ছোড়া যায় !' 'ছি ছি, দেখেছ প্রথম-বারেরটা ? লাগল কিনা গিয়ে একশো গজের গুলি যেখানে ছোড়া হয় সেখানে।' ছোটরা ঐ রকমই হয়ে থাকে। খোলাখুলিভাবেই তারা মনের কথা প্রকাশ করে, এতে কারে যে আঘাত করা হয়, সেটা ভেবে দেখে না।

যে সময়ে আমি অত্যন্ত অসহায় আর নার্ভাস বোধ করছিলাম, একা টাল লক্ষ্য-ভূমিতে যে আগন্তুক অফিসার তখন আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি দেশের অন্যতম বীর পুরুষ বলে আখ্যাত হয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ফীল্ড-মার্শাল আর্ল রবার্টস্ বলে খ্যাত হয়েছিলেন। যখনই কখনো গুলি ছোড়ার ব্যাপারে বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে গেছি (এমনটি বহুবার হয়েছে), সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে তাঁর শান্ত স্বরে তাড়াহুড়ো না করার উপদেশ, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন সময়েই কার্পণ্য করি নি।

ভয় জীবজন্তুর সমস্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তাদের সর্বদা প্রস্তুত করে রাখে ও জীবনের আনন্দ অনুভূতিতে উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই একই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় মানুষের মধ্যেও। ভয় আমায় শিখিয়েছে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে, গাছে উঠতে আর নিখুঁতভাবে শব্দ অনুসরণ করতে ; জঙ্গলের গভীরতম অন্তস্থলে প্রবেশ করে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে এখন সেখা দরকার

দৃষ্টিশক্তির আর রাইফেলের প্রকৃত ব্যবহার।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির পরিধি ১৮০ ডিগ্রি, তাই, জঙ্গলে যেখানে সব রকম প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলতে পারে—বিষাক্ত সাপ থেকে আরম্ভ করে অন্য কারুর হাতে আহত জন্তু পর্যন্ত, সেখানে প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সমস্ত পরিধিটার উপর তার প্রসার হয়। যা কিছু সামনে নড়াচড়া করে তা লক্ষ্য করা সহজ, কিন্তু যা কিছু নড়াচড়া করে দৃষ্টি-সীমানার বাইরে তা অস্ফুট আর অস্পষ্ট, এইসব অস্ফুট আর অস্পষ্ট নড়াচড়াগুলিই হয়ে ওঠে মারাত্মক। একেই ভয় করতে হয় সবচেয়ে বেশি। জঙ্গলের কোন প্রাণীই স্বভাবত মারমুখো নয়, তবে অবস্থার বিপাকে পড়ে কোন-কোন প্রাণী মারমুখো হয়ে উঠতে পারে, এ-হেন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাবধান হবার জন্যে দৃষ্টিশক্তিকে যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করা দরকার। একবার একটা গাছের খোপর থেকে একটা গোখরো সাপের চেরা জিভ মুখের ভিতর ঢুকছে আর বেরোচ্ছে দেখে, আর একবার একটা ঝোপের আড়ালে একটা আহত চিতাবাঘের লেজের ডগার নড়াচড়া দেখে আমি একেবারে চরম মুহূর্তে সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম—সাপটা ছোবল দিতে, আর চিতাবাঘটা আমার উপর লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়ে ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই ওরা ছিল আমার দৃষ্টি-পরিধির দূরতম সীমান্তে।

গাদা বন্দুকটা আমায় বারুদের ব্যবহারে সঞ্চয়ের অভ্যাস শিখিয়েছিল, আর এখন আমার রাইফেল হতে আমি ভেবে দেখলাম যে কোন বিশেষ নিশানায় লক্ষ্য অভ্যাস করে গুলি নষ্ট করার চাইতে বন মোরগ আর ময়ূরের উপর অভ্যাস করাই ভাল। কেবলমাত্র একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যখন আমায় রান্নার জন্যে পাখি মারতে গিয়ে বিফল হতে হয়েছিল। কোন পাখির পিছু নিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে তাকে বাগে পেয়ে গুলি করতে যে সময় লাগত বা যে হাঙ্গামা পোহাতে হত সেজন্যে আমার কোন বিরক্তি ছিল না, আর যখন ৪৫০ নং রাইফেলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে লক্ষ্যভেদ করার মত হাত হল, যে-সব অঞ্চলে আগে আমি ভয়ে প্রবেশ করতাম না সেখানে গিয়ে শিকার করার মত আত্মবিশ্বাসও আমার জন্মাল।

এমনি একটা অঞ্চল হল যেটা আমাদের বাড়িতে 'গোলাবাড়ির চত্বর' নামে খ্যাত হয়েছিল,—ঘনসন্নিবদ্ধ গাছে আর লতায় ছাওয়া বহু মাইল বিস্তৃত এই এলাকায় অসংখ্য মোরগ আর বাঘ গুঁড়ি মেরে বেড়াত। 'গুঁড়ি মারা' কথাটা অতিশয়োক্তি নয়, অন্তত বনমোরগের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কারণ সেই সময়ে যত পাখি আমি ওখানে দেখেছি এমনটি আর কোথাও দেখি নি। কোটা-কালাঢুঙ্গি রোডের খানিকটা এই অঞ্চলের উপর দিয়ে গেছে; ক-বছর পরে ডাক-

হরকরা আমায় বলেছিল যে সে এই পথে 'পাওয়ালগড়ের কুমার' বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে।

এই অঞ্চলের আশে-পাশে আমি আমার গুলতি আর গাদা-বন্দুক ব্যবহারের দিনে মাঝে-মাঝে ঘুরে ফিরেছি, কিন্তু যতদিন না এই ৪৫০টা হাতে আসে ততদিন ভিতরে ঢুকতে সাহস করি নি। জঙ্গলটার মধ্য দিয়ে একটা গভীর অপরিসর দরিপথ চলে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় আমি এই দরিপথ ধরে বেরিয়েছি রান্নার জন্যে একটা শুয়োর শিকার করতে, এমন সময় আমার কানে এল, কতগুলো বন-মোরগ আমার ডাইনের জঙ্গলে শুকনো পাতা আঁচড়াচ্ছে। দরিপথের একটা পাথরের উপর উঠে বসে পড়লাম, তারপর সন্তর্পণে মাথা তুলে দেখলাম, তীরের উপর গোটা কুড়ি-তিরিশ বন-মোরগ খেতে খেতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে,—একটা বুড়ো মোরগ পুরো পেখম খুলে তাদের পুরোভাগে রয়েছে। মোরগটাকে বেছে নিয়ে আমি বন্দুকের ঘোড়ায় হাত দিয়ে অপেক্ষা করছি কখন সে কোন একটা গাছের সঙ্গে এক লাইন হচ্ছে (পেছনে কোন শক্ত জিনিস না রেখে আমি কখনো কোন পাখিকে গুলি করি না), এমন সময় দরিপথের বাঁয়ে একটা ভারি জন্তুর সাড়া পেলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ আমায় লক্ষ্য করে লাফাতে লাফাতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। কোটা রোডটা ওখানে পাহাড়টা অতিক্রম করে চলে গেছে আমার থেকে দুশো গজ-টাক উপরে। বোঝা গেল রাস্তায় কিছু একটা থেকে ভয় পেয়ে চিতাবাঘটা প্রাণপণে দৌড়ে কোথাও গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে। বন-মোরগগুলোও চিতাবাঘটাকে দেখতে পেয়েছিল, তাই তারা প্রচুর ডানা-ঝট-পট করতে করতে উপরে উঠে গেল আর আমি চুপি-সাড়ে তার মুখোমুখি হলাম। চারদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমার নড়াচড়া লক্ষ্য করতে না পেরে চিতাবাঘটা সোজা দৌড়ে এল,—থামল একেবারে দরিপথটার ধারে এসে।

দরিপথটা এখানে প্রায় পনেরো ফুট চওড়া,—তার দু-দিকে খাড়াই পাড়; বাঁ দিকে বারো ফুট আর ডান দিকে আট ফুট। ডান দিকের পাড়ের ফুট-দুয়েক নিচে হল আমার বসার পাথরটা। চিতাবাঘটা তাই ছিল আমার থেকে একটু উঁচুতে, আর দরিপথটা যতটা চওড়া ততটা তফাতে। দরিপথের ধারে এসে সে পেছন ফিরে তাকাতে তার অলক্ষিতে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নেবার সুযোগ হল। তার বুক লক্ষ্য করে নিশানা ঠিক করলাম, এবং যে-মুহূর্তে সে আবার আমার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করলাম। কালো পাউডারের কার্ট্রিজ থেকে ধোঁয়ার মেঘ উঠে আমার দৃষ্টি আড়াল করল। এক ঝলকের মত কেবল দেখলাম,

চিতাবাঘটা আমার মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে আমার পেছন দিকে গিয়ে পড়ল, আর যে পাথরের উপর আমি বসে ছিলাম সেখানে আর আমার পোশাকে প্রচুর রক্ত পড়ল।

রাইফেলের উপর পূর্ণ আস্থা আর নির্ভুল নিশানা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্বেও যখন দেখলাম যে চিতাবাঘটা মরে নি, আহত হয়েছে মাত্র, আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হতে লাগল। আঘাতটা যে গুরুতর হয়েছে তা আমি রক্তের পরিমাণ দেখে বুঝলাম; কিন্তু রক্ত দেখে ক্ষতের স্থানটা, আর তা মারাত্মক হয়েছে কি না তা বোঝবার মত অভিজ্ঞতা তখন আমার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ না করলে পাছে সে পালিয়ে গিয়ে কোন অগম্য গুহায় বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে যেখানে আর তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না, তাই আমি রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিয়ে রক্ত অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম।

সামনে একশো গজের মত সমতল জমি, আর মাঝে-মাঝে ছড়ানো-ছিটানো দু-একটা গাছ বা ঝোপ, তার পরেই খাড়াই পঞ্চাশ গজ মত নেমে গিয়ে আবার সমতল জমি। এই খাড়াই পাহাড়ের ধারে অনেকগুলো ঝোপ-ঝাড় আর বড়-বড় পাথর, তারই কোন একটার পেছনে হয়ত চিতাবাঘটা আশ্রয় নিয়েছে। চূড়ান্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রতি ফুট জমির উপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি। অর্ধেকটার মত নেমেছি, এমন সময় প্রায় গজ-কুড়ি দূরে একটা পাথরের পেছনে দেখলাম চিতাবাঘটার ল্যাজটা, আর পেছনের একটা পা। চিতাবাঘটা জীবিত কি মৃত তা জানা না থাকায় আমি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও সেই পা-টা সরিয়ে নিল। এখন কেবল তার ল্যাজটা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং চিতাবাঘটা বেঁচে আছে, এবং তাকে গুলি করতে হলে আমার হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে একটু সরে যাওয়া দরকার। গায়ে গুলি লেগে যখন ও মরে নি তখন ঠিক করলাম এবার ওর মাথায় গুলি করব। এই ভেবে আমি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বাঁ দিকে সরতে লাগলাম যতক্ষণ না তার মাথাটা দৃশ্যমান হল। পাথরটার উপর পিঠ করে সে শুয়ে ছিল, অন্য দিকে তাকিয়ে। আমি কোন শব্দ না করলেও চিতাবাঘটা আমার এগিয়ে আসা বুঝতে পেরেছিল। আমার দিকে মুখ ফেরাতে যাচ্ছে, এই সময় আমার গুলি তার কানে গিয়ে বিঁধল। গুলিটি অল্প দূর থেকে ছোড়া হয়েছিল, আর তা ছাড়া আমি ভালভাবে লক্ষ্য স্থির করে তবে গুলি ছুড়েছিলাম, সুতরাং নিশ্চয় হওয়া গেল যে চিতাবাঘটা মারা পড়েছে তখন আমি তার কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে সেই রক্তের মধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

এই আমার প্রথম চিতাবাঘ শিকার—তাই সেটার দিকে তাকিয়ে আমার যা মনোভাব হল তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। খাড়াই পাহাড় বেয়ে তার নেমে আসা থেকে, পাছে রক্ত লেগে তার চামড়া নষ্ট হয়ে যায় তাই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা—এ পর্যন্ত আমার হাত কাঁপে নি। কিন্তু এখন আমার সর্বশরীর থর-থর করে কেঁপে উঠল—এই ভেবে যে, চিতাবাঘটা যদি লাফিয়ে উঠে আমায় ডিঙিয়ে না গিয়ে আমার মাথার উপর পড়ত, কী সর্বনাশই না হত তাহলে! চমৎকার প্রাণীটি শিকার করার আনন্দে, এবং তার চেয়েও বেশি, বাড়ি গিয়ে এই সাফল্যের কথা বললে তারাও আমারই মত খুশি হবে ও গর্ব বোধ করবে এই ভেবে আবার আনন্দেও কাঁপতে লাগলাম। ইচ্ছে হল একই সঙ্গে চিৎকার করি, নাচ শুরু করি, গান গেয়ে উঠি। কিন্তু সে-সব কিছুই করলাম না, কারণ আমার সে মনোভাব এই নির্জন বনে প্রকাশ করবার নয়,—অপরের সঙ্গে তা ভাগ করে তবে আমার শান্তি।

চিতাবাঘের ওজন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু তবু আমি এটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। তাই রাইফেলটা নামিয়ে আমি কতকগুলো রক্তকাঞ্চনের লতা সংগ্রহ করে এনে ভাল করে ছাড়িয়ে সেই শক্ত দড়ি দিয়ে চিতাবাঘটার চারটে পা একসঙ্গে করে বাঁধলাম। তারপর উবু হয়ে বসে তার পা-গুলো কাঁধে দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। তখন আমি চিতাবাঘটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম পাথরটা পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার টানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখলাম আমি ওটাকে তুলতে পারছি না। যখন দেখলাম যে চিতাবাঘটাকে ফেলেই যেতে হবে, তাড়াতাড়ি কিছু ডাল-পালা ভেঙে এনে সেটাকে চাপা দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ির পথ ধরলাম,—বাড়ি ওখান থেকে তিন মাইলের পথ। সব শুনে বাড়িতে প্রচুর উত্তেজনা ও আনন্দের সৃষ্টি হল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ম্যাগি আর দুটো জোয়ান চাকরের সঙ্গে আমার প্রথম চিতাবাঘটাকে নিয়ে আসতে চলে গেলাম।

আমার কপাল ভাল যে নতুন শিকারীদের ভুলচুকের জন্যে প্রকৃতি দেবী শাস্তিবিধান করেন না। নতুবা চিতাবাঘের সঙ্গে এই প্রথম সম্পর্কই আমার শেষ সম্পর্ক বলে প্রমাণিত হত। ভুলটা হল, চিতাবাঘটা ছিল আমার থেকে উপরে, এবং আমি ছিলাম তার লাফের পাল্লার মধ্যে,—অথচ তার শরীরের কোন্‌খানে গুলি করলে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে তা সঠিক না জেনে গুলি করা। তখন পর্যন্ত আমার মোট শিকার হয়েছিল একটা চিতল—গাদা বন্দুকে শিকার করা, আর তিনটে শুয়োর ও একটা কক্ক হরিণ—৪৫০ নম্বর রাইফেলটায় শিকার করা।

শুয়োরগুলো আর কুকুটাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলেছিলাম, তাই আমার বিশ্বাস ছিল যে বুকে গুলি করলেই চিতাবাঘটাও মারা পড়বে.—এবং এইখানেই আমার ভুল হয়েছিল। পরে আমি জেনেছিলাম যে চিতাবাঘকেও এক গুলিতে মেরে ফেলা যায় বটে, কিন্তু তা বুকে গুলি করে নয়।

গুলি মারাত্মক না হলে বা তাতে নড়াচড়ার ক্ষমতা লোপ না পেলে চিতাবাঘ এলোমেলোভাবে লাফিয়ে ওঠে, এবং যদিও আহত হওয়ামাত্র চিতাবাঘ কখনো শিকারীকে আক্রমণ করে না তাহলেও এলোমেলো লাফের ফলে হঠাৎ শিকারীর উপর এসে পড়াটা বিচিত্র নয় তার পক্ষে, বিশেষ করে যখন সে থাকে শিকারীর থেকে উপরে, এবং লাফের পাল্লার মধ্যে। এ-হেন বিপদের সম্ভাবনা আরও বর্ধিত হয় যখন শিকারীর অবস্থিতি চিতাবাঘের জানা না থাকে। সে যে লাফিয়ে আমার মাথার উপর না পড়ে আমার পেছনে গিয়ে পড়েছিল এ আমার নিতান্ত সৌভাগ্য ছাড়া কিছু নয়, কারণ যদি আমার উপর পড়ত তাহলেও তা আক্রমণের চয়ে কম মারাত্মক হত না।

বুকে গুলির ফলাফল কত অনিশ্চিত হতে পারে তার উদাহরণস্বরূপ আর একটা ঘটনা বিবৃত করছি। কালাঢুঙ্গির জঙ্গলে ঘাস কমে এলে আমাদের গ্রামের গরু-বাছুর মঙ্গোলিয়া খাত্তায় চরতে যেত। একবার শীতকালে আমি আর ম্যাগি সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করছিলাম। একদিন প্রাতরাশের সময় একপাল চিতলের ডাক শুনে বুঝলাম যে একটা চিতল চিতাবাঘের কবলে মারা পড়েছে। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যই হল, যে-চিতাবাঘটা গরু-বাছুর মারছিল তাকে গুলি করা, তাই মনে হল এই সেই সুযোগ। ম্যাগিকে প্রাতরাশে রেখে একটা '২৭৫ নম্বর রাইফেল নিয়ে আমি খোঁজ করতে বেরোলাম।

চিতলের ডাকটা আসছিল আমাদের পশ্চিম দিকে চারশো গজ দূর থেকে; কিন্তু সেখানে যেতে হলে খানিকটা অভেদ্য বেত-ঝোপ আর জলা জায়গা এড়িয়ে একটু ঘুরে যেতে হয়। দক্ষিণ দিক থেকে চিতলদের দিকে অগ্রসর হতে আমার মুখে হাওয়া লাগল। দেখলাম গোটা-পঞ্চাশেক চিতল হরিণ আর হরিণী খানিকটা পোড়া ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বেত-ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেতের ঝোপ আর ঢাকা জায়গাটার মাঝামাঝি দুশো গজ মত চওড়া একটা ঘাস-জমি,—দেখলাম আমার থেকে ষাট গজ মত তফাতে একটা চিতাবাঘ একটা পুরুষ-চিতলকে ঘাস-জমিটার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। চিতলগুলির অলক্ষ্যে থেকে চিতাবাঘটার দিকে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব নয়, এবং তারা আমায় দেখতে পেলেই আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সাবধান হবে, চিতাবাঘটাও হয়ে পড়বে সতর্ক।

তাই আমি বসে পড়লাম এবং তারপর রাইফেলটা তুলে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

চিতল হরিণটা যেমন বড় তেমনি ভারি, রুক্ষ মাটির উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া চিতাবাঘটার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাই সে চিতলটাকে ছেড়ে দাঁড়াল আমার দিকে মুখ করে। চিতাবাঘের পেটে কালো কালো ছোপগুলো থাকায় নিখুঁত রাইফেল হলে ষাট গজ দূরে থেকেও লক্ষ্যভেদ করা সহজ, এবং ঘোড়াটা টিপবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝলাম আমি যেখানে চেয়েছি সেখানেই গুলিটা লেগেছে। গুলি লাগতেই চিতাবাঘটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল, তারপর চার পায়ে মাটিতে পড়েই সবেগে ঘাস-জমি লক্ষ্য করে ছুটল। চিতাবাঘটা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম, রক্তের দাগ ঘাস-জমির দিকে চলে গেছে,—এখানকার ঘাস কোমর পর্যন্ত উঁচু। একটা গাছ থেকে কিছু ডালপালা নিয়ে চিতলটাকে ঢেকে দিলাম যাতে শকুনের নজরে না পড়ে, কারণ চিতলটা ছিল ভেলভেট রঙের, আর বয়সেও তাজা,—চামড়াটা পেলে খুশি হবেন আমার আত্মীয়রা। তারপর তাঁবুতে ফিরে এসে প্রথমে প্রাতরাশ সারলাম, তারপর আমাদের চারজন প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চিতলটা আনতে আর আহত চিতাবাঘটাকে অনুসরণ করতে। যেখান থেকে গুলি করেছিলাম তার কাছাকাছি যেতে একজন আমার কাঁধে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে, আমাদের সামনে ডানদিকে যেখানে জমি শেষ হয়ে ঘাস-জমি শুরু হয়েছে সেই জায়গাটায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যা সে আমায় দেখাতে চাইছিল কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম তা। সে হল একটা চিতাবাঘ,—ঘাস-জমির ধারের দিকে আমাদের থেকে আড়াইশো গজ মত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের প্রজারা যখন আমাদের সঙ্গে তাঁবুতে আসত সে কাজের জন্যে কিছুতেই কোন পারিশ্রমিক নিত না, কিন্তু জঙ্গলে এলে তখন আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, কে সবার আগে কোন শিকারের সন্ধান দিতে পারে, আর তাতে যখন আমি হারি, মহানন্দে তারা বাজির টাকাটা গ্রহণ করে। যে-দুজন চিতাবাঘটা একসঙ্গে দেখছে বলে দাবি করছে তাদের হাতে বাজির টাকাটা দিয়ে দিয়ে আমি তাদের বললাম বসে পড়তে, কারণ ইতিমধ্যে চিতাবাঘটা মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। বুঝলাম এ নিশ্চয় সেই আহত চিতাবাঘটার জোড়া, এবং এও আমারই মত আকৃষ্ট হয়ে দেখতে এসেছে তার বন্ধু কী শিকার করেছে। আমাদের থেকে একশো গজ দূরে ঘাসের কয়েকটা গুচ্ছ ঢাকা জায়গাটার দিকে কয়েক গজ এগিয়ে গেছে, সেখান থেকে মরা চিতলটা দেখা যায়। কয়েক

মিনিট সে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। ইচ্ছে করলেই তার বুকে গুলি করতে পারতাম, কিন্তু একটা চিতাবাঘ তো বুকে গুলি খাওয়া অবস্থায় রয়েছে, তাই আর তখন গুলি করলাম না।

মড়িটার উপর সে-সব ডালপালা চাপা দিয়েছি অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে চিতাবাঘটা লক্ষ্য করতে লাগল সেগুলো। যাই হোক, চারদিকে সাবধানী দৃষ্টিপাত করে সে সন্তর্পণে মড়িটার দিকে অগ্রসর হল, আর তা করতে গিয়ে যেই সে আমার দিকে পাশভাবে দাঁড়াল তার বাঁ কাঁধের দু-এক ইঞ্চি নিচে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলাম। গুলি লাগতেই সে পড়ে গেল, আর নড়ল-চড়ল না। কাছে গিয়ে দেখলাম, মারা গেছে সে। বাঁশে করে বেঁধে চিতাবাঘটাকে তাঁবুতে রেখে এসে চিতলটার জন্যে আবার ফিরে আসবার নির্দেশ দিয়ে আমি সেই কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাস-জমির মধ্যে আহত চিতাবাঘটাকে অনুসরণের অত্যন্ত অপ্রীতিকর কাজে ব্যাপৃত হলাম।

আহত প্রাণীকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করে মারতে হবে—এই অলিখিত আইন সমস্ত শিকারীই মেনে চলে। এবং মাংসাশী প্রাণীর ব্যাপারে বিভিন্ন শিকারীর এ বিষয়ে নিজ-নিজ পদ্ধতি আছে। যাদের সঙ্গে হাতি আছে এ কাজ তাদের পক্ষে সহজ ; কিন্তু যারা আমার মত মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকার করে, নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের জানতে হবে কিভাবে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে সেই মাংসাশী প্রাণীর সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করা সম্ভব। জঙ্গলে আগুন দিয়ে আহত জন্তুকে তাড়িয়ে আনার পদ্ধতিটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ক্ষতিকর ; কারণ যদি তার নড়াচড়ার শক্তি থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তার ভাগ্যলিপি—দু-দিন আগে বা পরে ; আর যদি তার চলৎশক্তি না থাকে তাহলে অতি অবশ্যই তাকে জীবন্ত পুড়ে মরতে হবে।

বড় বড় ঘাসে ছাওয়া জায়গায় মাংসাশী প্রাণীর রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে প্রচুর বিপদের সম্ভাবনা। তাই এ-হেন ঘাস-জমিতে কোন আহত প্রাণীকে অনুসরণ করতে হলে আমি রক্ত-চিহ্ন না দেখে লক্ষ্য করি কোন্ দিকে সে গেছে, তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে অগ্রসর হই সেদিকে—একই সঙ্গে বিপদের জন্যে তৈরি থেকে এবং সাফল্যের আশা পোষণ করে। যে-কোন আহত প্রাণী সামান্যতম শব্দ শুনলেও হয় আক্রমণ করে, কিংবা কোনরকম নড়াচড়া করে তার অবস্থিতি জানিয়ে দিয়ে থাকে। আক্রমণ যদি কার্যকরী না হয় এবং নড়াচড়ার ফলে তার অবস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে একটা ঢিল বা কাঠের টুকরো কিংবা একটা টুপি ছুড়েও কাজ হাসিল করা যেতে পারে, কারণ যেই সে

সেই নিক্ষিপ্ত বস্তুটিকে আক্রমণ করবে তক্ষুনি তাকে গুলি করলেই হল। এ ব্যবস্থা কার্যকরী হয় তখনই, যখন ঘাসকে আন্দোলিত করবার মত বাতাস না থাকে, এবং শিকারীর ঘাসের মধ্যে গুলি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকে। কারণ আহত মাংসাশী প্রাণী বিরক্ত হলে যতই গর্জন করুক তারা লুকিয়ে থাকে মাটির সঙ্গে মিশে, এবং পারতপক্ষে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে না।

'মঙ্গোলিয়া খাত্তায় সেদিন কিছুমাত্র বাতাস ছিল না, তাই আমি লোকজনদের বিদায় দিয়ে রক্ত-চিহ্ন ধরে পোড়া মাটি দিয়ে এগোতে-এগোতে ঘাস-জমির মধ্যে প্রবেশ করলাম। রাইফেলে গুলি-ভরা আছে এবং ঠিক চালু আছে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই ঘাস-জমির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে শিস দেবার শব্দ আমার কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার লোকজনআমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের কাছে ফিরে যেতে তারা আমায় মরা চিতাবাঘটা দেখালো। দেখলাম তার শরীরে তিনটে গুলির গর্ত রয়েছে। জন্তুটাকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধতে গিয়ে এটা তাদের চোখে পড়ে। একটা লেগেছে তার বাঁ কাঁধের নিচে, যে আঘাতে সে মারা পড়েছে, আর অন্য দুটোর একটা লেগেছে বুকের ঠিক মাঝখানে, আর অপরটা লেজের গোড়া থেকে দু-ইঞ্চি ভিতরে। এই গুলিটা শরীরের ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে চিতাবাঘটার তার শিকারে ফিরে আসবার কারণ ছিল যথেষ্ট, এবং সে কারণ যখন জানতে পারলাম, অনুশোচনায় আমার মন ভরে উঠল। চিতাবাঘের বাচ্চারা অতি অল্প বয়স থেকেই নিজেদের খাবার সংগ্রহ করতে শেখে—ছোট ছোট পাখি, ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদি মেরে; এবং আমি আশা করি যে, যে বীর মাতা আহত হওয়া সত্ত্বেও সন্তানদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে প্রাণহানির আশঙ্কা পর্যন্ত উপেক্ষা করল, তার সন্তানদের নিজেদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের বয়স হয়েছে; কারণ অনেক সন্ধান করেও আমি তাদের দেখা পাইনি।

এই যে আমি বললাম আহত চিতাবাঘটার পিছু নেবার জন্যে ঘাস-জমিতে ঢোকার আগে আমি নিশ্চিত হয়ে নিলাম রাইফেলটা গুলি-ভরা আর চালু আছে, শিকারীদের কাছে এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে, কারণ এর এক মিনিট আগেই যখন আমি একটা গুলি-করা চিতাবাঘের কাছে গিয়েছিলাম তখন আমার রাইফেল খালি ছিল না, কারণ আমার জানা ছিল না সে জীবিত কি মৃত। কাজেই রাইফেলে গুলি ভরা আছে কি না সে বিষয়ে নতুন করে নিশ্চয় হবার আর কী দরকার হতে পারে? বলছি। কেবল এই বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে

আমি তা করেছি,—যখনই রাইফেলের গুলি ভরা থাকা না থাকার উপর আমার জীবন মরণ নির্ভর করেছে। সৌভাগ্যবশত এ শিক্ষা আমার হয়েছিল অল্প বয়সেই, এবং আজও যে আমি বেঁচে থেকে এ কাহিনী শোনাতে পারছি, আমার ধারণা এই কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

মোকামা ঘাটে কাজ শুরু করার অল্পদিন পরেই ('আমার ভারত' বইয়ে আমি সে কথার উল্লেখ করেছি) আমি শিকারের জন্যে দুই বন্ধুকে কালাঢুঙ্গিতে নিমন্ত্রণ করে আনি। তারা হল সিলভার আর ম্যান,—ভারতে নতুন এসেছে, জঙ্গলে গুলি ছোড়ার কোন অভিজ্ঞতাই তাদের ছিল না। ওরা যেদিন আসে তার পরের দিন সকালে আমি ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হলদোয়ানি রোড ধরে মাইল-দুই অগ্রসর হবার পর আমি সাড়া পেলাম, রাস্তার ঠিক ডান দিকেই একটা চিতাবাঘ একটা হরিণ শিকার করছে। ওদের পক্ষে চিতাবাঘটার পিছু নেওয়া সম্ভব নয় বুঝে আমি ঠিক করলাম ওদের একজনকে মড়ির উপরের একটা গাছে উঠতে বলব। আমি ওদের লটারি করতে বললাম। সিলভারের ছিল ·৫০০ ডি. বি. রাইফেল, আর ম্যান-এর ·৪০০ এস. বি. রাইফেল,—দুটোই পরের জিনিস, ধার করা। আর আমার ছিল ·২৭৫ ম্যাগাজিন রাইফেল। সিলভারের বয়স একটু বেশি আর তার অস্ত্রও একটু বেশি ভাল বলে ম্যান প্রচুর খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় দিয়ে লটারিতে রাজি হল না, এবং আমরা তিনজনেই একসঙ্গে মড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। যখন সন্ধান পেলাম, চিতল হরিণটা তখনও ছটফট করছে—চমৎকার পুরুষ-চিতল একটা। সিলভারের জন্যে একটা গাছ ঠিক করে আর ম্যানকে তার সাহায্যের জন্যে রেখে আমি চিতাবাঘটাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, পাছে সে সিলভারের গাছে ওঠাটা দেখে ফেলে। চিতাবাঘটা ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, এখান থেকে তার নড়বার ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক, সামনে দাঁড়িয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে নড়াচড়া করে আমি ওকে তাড়াতে সমর্থ হলাম। তারপর ফিরে এলাম মড়িটার কাছে। সিলভার জীবনে কোন গাছে ওঠে নি, তাই সে প্রচুর অস্বস্তি বোধ করছিল, এবং যখন তাকে বললাম যে চিতাবাঘটা একটা বিরাট পুরুষ চিতাবাঘ এবং খুব সাবধান হয়ে তাকে গুলি করা উচিত, জানি না তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল কি না। মিনিট পাঁচেক মাত্র অপেক্ষা করতে হবে—তাকে এই আশ্বাস দিয়ে আমি ম্যানকে নিয়ে চলে গেলাম।

মড়ি থেকে একশো গজ দূরে একটা দাবানল-পথ হলদোয়ানি রোডকে কেটে চলে গেছে। এই পথ ধরে ম্যান আর আমি জঙ্গলের দিকে সামান্যমাত্র অগ্রসর

হয়েছি, এমন সময় সিলভার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটো গুলি ছুড়েছিল। সেদিকে ফিরতেই দেখি, চিতাবাঘটা দাবানল-পথটা কেটে সবেগে ধেয়ে চলেছে। সিলভার বলতে পারল না চিতাবাঘটার গায়ে গুলি লেগেছে কি না, তবে, যেখানে আমরা ওকে দাবানল পথটা কেটে চলে যেতে দেখেছিলাম সেখানে রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। সঙ্গীদের সেখানে আমার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে বলে আমি একা চিতাবাঘটার পিছু নিলাম। এই ব্যাপারের মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই, তার উল্টোটাই বরং, কারণ আহত মাংসাশী প্রাণীর পিছু নিতে হলে অনন্য-মনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে গুলি-ভরা বন্দুকের ঘোড়ায় হাত-রাখা মানুষ সঙ্গী হিসেবে অস্বস্তিকর। আমি খানিকটা এগোতে সিলভার এসে আমার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি রাজি না হওয়ায় ও তখন অনুরোধ করল অন্তত তার রাইফেলটা সঙ্গে নিতে,—কারণ যদি চিতাবাঘটা আমায় আক্রমণ করে আর আমার হাল্কা রাইফেল আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে তার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। ওকে খুশি করবার জন্যে আমরা রাইফেল বদলা-বদলি করলাম। সিলভার ফিরে গেল, আর আমিও এগিয়ে চললাম; কিন্তু তার আগে রাইফেলের ভাঁজটা খুলে দেখে নিশ্চয় হয়ে নিলাম যে দুটো চেম্বারেই গুলি ভরা আছে।

শ-খানেক গজ মত জমি মোটামুটি ফাঁকা, তারপরই কিন্তু রক্তের দাগ আবার আমায় ঘন ঝোপের সামনে নিয়ে গেল। সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে চিতাবাঘটার সাড়া মিলল—সামনের দিকেই নড়ে উঠল সে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি সে আমায় আক্রমণ করবে, কিন্তু সে সাড়া আর দ্বিতীয় বার পেলাম না। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি ঝোপটার মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুড়ি গজ মত অগ্রসর হয়ে, যে জায়গায় সে শুয়ে ছিল আর যেখান থেকে তার সরে যাওয়ার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে জায়গাটার সন্ধান পেলাম। এখন আমাকে এক পা এক পা করে অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দেড়শো গজ এভাবে চিহ্ন ধরে অগ্রসর হবার পর বন অনেকটা ফাঁকা হয়ে এল। এখন আমার পক্ষে আর একটু দ্রুত চলা সম্ভব হল। আরও একশো গজের মত এগোবার পর একটা বড় হলদু গাছের কাছে এসেছি, এমন সময় গাছটার ডাইনে চিতাবাঘটার বেরিয়ে-থাকা লেজের আগাটা আমার চোখে পড়ল। বোঝা গেল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে এ কথা বুঝতে পেরে সে আক্রমণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধের বলে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে, এবং সে যে আক্রমণ করবেই সে বিষয়ে আমার সন্দেহ-মাত্র রইল না।

সোজাসুজি আক্রমণ প্রতিহত করাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে এই স্থির করে আমি গাছটার বাঁ দিকে সরে গেলাম। চিতাবাঘটার মাথাটা আমার চোখে পড়ল,—আমার দিকে মুখ করে সে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার থুতনি সামনের দিকে প্রসারিত দুই থাবার উপরে। তার চোখ খোলা, তার দু-কানের ডগা আর জুলপি কাঁপছে। আমি যখন গাছটার বাঁ দিকে গেলাম তখনই তার আক্রমণ করার কথা, কিন্তু তা যখন করেনি তখন আমিও গুলি করলাম না কারণ, মাত্র কয়েক ফুট তফাত থেকে তার মাথাটা উড়িয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে ছিল না, আমার ইচ্ছে ছিল তার শরীরে কোথাও গুলি করব, যাতে সিলভারের স্মারক চিহ্নটা নষ্ট না হয়। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে এবং দেখতে দেখতে তার চোখ বুজে এল। বুঝলাম মারা গেছে চিতাবাঘটা,—আমার চোখের সামনে। আরও নিশ্চয় হবার জন্যে আমি কাশলাম, কিন্তু তাতেও কোন সাড়া না পেয়ে তখন একটা ঢিল তুলে তার মাথায় মারলাম।

আমার ডাক শুনে সিলভার আর ম্যান আমার কাছে এল। রাইফেলটা সিলভারের হাতে দেবার আগে আমি ভাঁজটা খুলে গুলিদুটো বার করলাম। মহা আতঙ্কের সঙ্গে দেখলাম, দুটো গুলিই খালি, শুধু খোলদুটো আছে। গুলি-না-ভরা রাইফেলের ঘোড়া টিপে অনেক শিকারীই বিপদে পড়েছে,—আর রক্তের দাগ লক্ষ্য করে এগোতে এগোতে যদি আমার গতি মন্থর না হত তাহলে আমাকেও তাদের দলে পড়তে হত। এই যে শিক্ষা আমার হল, আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে সেজন্যে আমায় কোন বিপদে পড়তে হয় নি; এবং সেই থেকে আর কখনো আমি বন্দুক ঠিকমত গুলি ভরা আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোন বিপজ্জনক কাজে অগ্রসর হই নি। দোনলা রাইফেল হলে গুলি একটা নল থেকে অপর নলটায় বদলে নিই, আর একনলা হলে আমি গুলিটা বার করে দেখি বোল্টটা ঠিকমত কাজ করছে কি না, তারপর আবার ভরে নিই গুলিটা।

১০

কুঁয়র সিং, যার কথা আমি 'আমার ভারত' বইয়ে লিখেছি, কালাঢুঙ্গির কাছাকাছি জঙ্গলে শিকারের ব্যাপারে তার প্রচুর আপত্তি ছিল। কারণ সেখানে এত বেশি লতাপাতা মাটি ছেয়ে থাকত যে কর্তব্যপরায়ণ বনরক্ষক বা ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের কবল থেকে পালাতে খুব অসুবিধে হত। এই কারণে সে তার চোরাই শিকারের সমস্ত কার্যকলাপ গারুপ্পুর বনেই সীমাবদ্ধ রাখত। বনচারী হিসেবে সে আমার যত

প্রশংসার পাত্রই হোক অন্তত শিকারী হিসেবে কোন অতিমানবিক গুণ তার ছিল না। এর কারণ আমার মনে হয়, যে বনে সে শিকার করত অসংখ্য শিকারের প্রাণী সেখানে। জীবজন্তুর প্রতিটি চলার পথ, আর হরিণ চরে এমন প্রত্যেকটি ফাঁকা জায়গা তার ভালভাবে জানা থাকার ফলে সে সোজা বনে প্রবেশ করত, নীরবতা সম্বন্ধে কোনরকম সাবধানতা না নিয়েই; ভাবটা যেন এই যে, যদি বা একটা ফাঁকা জায়গায় হরিণগুলো চমকে পালিয়ে যায় তো আরেকটায় নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি হরিণ মিলবে। কিন্তু তবুও আমার অনেক শিক্ষাই কুঁয়র সিং-এর হাতে হয়েছে যা আমি সর্বদাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে এসেছি; অজানা সম্বন্ধে আমার মধ্যে যে আতঙ্ক ছিল তারও কিছুটা আমার দূর হয়েছে তারই কল্যাণে। এ-হেন একটা আতঙ্ক হল দাবানল। দাবানলের বিপদের কথা শুনে আর আমাদের জঙ্গলে তার পরিণতি লক্ষ্য করে এই ভয়ই আমার মনের অন্তরালে আশ্রয় করেছিল যে কোনদিন আমি দাবানলের কবলে পড়ে জীবন্ত পুড়ে মরব। কুঁয়র সিংই আমার মন থেকে এই ভয় দূর করে দেয়।

কুমায়ুনের পাদদেশীয় গ্রামাঞ্চলের মানুষরা সবাই পরস্পরের ব্যাপারে উৎসাহী, আর যে-সব মানুষ কখনো খবরের কাগজ চোখে দেখে না এবং যাদের জীবন তাদের গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি ঘিরে যে জঙ্গল তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে-কোন সামান্য খবরও সেখানে প্রচুর কৌতুহলের সৃষ্টি করে ও মুখে মুখে ফিরতে থাকে, বার-বার শুনেও তা পুরোনো হতে চায় না। তাই যখন সে আমার চিতাবাঘ শিকারের খবর পেল তখনো চিতাবাঘটার শরীর ঠাণ্ডা হয়েছে কি না সন্দেহ, এবং খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি নিয়ে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাতেও তার দেরি হল না। সার্জেন্টের দেওয়া রাইফেলটার কথা সে জানত বটে, কিন্তু চিতাবাঘটা না মারা পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারে নি যে তা ব্যবহার করার সামর্থ্য আমার আছে। এখন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে আমার আর আমার রাইফেলের ব্যাপারে প্রচুর কৌতুহল প্রকাশ করল। সেদিন সে চলে যাবার আগে কথা হল, পরদিন ভোর পাঁচটার সময় গারুপ্পু রোডের চার নম্বর মাইল-স্টোনের কাছে আমার তার সঙ্গে দেখা হবে।

ম্যাগি যখন এক কাপ চা তৈরি করে আমার হাতে দিল তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক ঘণ্টা সময় থাকতে আমি কুঁয়র সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে বেরোলাম। এই নির্জন জংলা পথে আমি এইভাবে অনেকবার হেঁটেছি, তাই অন্ধকারের ভয় আমার ছিল না। চার নম্বর মাইল-স্টোনের কাছে পৌঁছতে

রাস্তার ধারের একটা গাছের নিচে আগুন দেখতে পেলাম। কুঁয়র সিং আমার থেকে আগেই এসে গেছে। আগুনে হাতদুটো গরম করব বলে তার পাশে বসতেই সে বললে, 'হায় হায়, এত তাড়াতাড়ি করে তুমি এসেছ যে ট্রাউজার্স পরতেই ভুলে গেছ!' বৃথাই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমি ভুল করি নি, এই প্রথম আমি একটা নতুন ধরনের পোশাক পরেছি যাকে বলা হয় শর্টস্। কিন্তু তবুও সে বলে চলল যে আমি যা পরে আছি তা জাঙ্গিয়া এবং বনে শিকারের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত,—এবং তার দৃষ্টি দিয়ে এটাই সে বলতে চায় যে আমার পোশাক যে-রকম অভব্য তাতে আমার সঙ্গে তাকে দেখা গেলে তার মাথা কাটা যাবে। শুরুতেই এই বাগড়া পড়ার ফলে সহজে আবহাওয়া পরিষ্কার হল না যতক্ষণ না কাছের একটা গাছে একটা মোরগ ডেকে উঠল। তা শুনেই কুঁয়র সিং তক্ষুনি খাড়া হয়ে উঠল, তারপর আগুনটা নিবিয়ে দিয়ে বললে, 'এবার বেরিয়ে পড়া দরকার, কারণ অনেকটা যেতে হবে।'

সেখান থেকে বেরোতেই জঙ্গলে প্রাণের সাড়া জেগে উঠতে লাগল। যে বন-মোরগটা আমাদের আগুনের সাড়ায় জেগে উঠে নতুন দিনকে স্বাগত করে ডেকে উঠেছিল, একটা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল সে, এবং প্রতিটি পাখি ছোট-বড় নির্বিশেষে ঘুম ভেঙে উঠে এই ক্রমবর্ধমান শব্দ-সমষ্টিতে কণ্ঠ দান করল। বন-মোরগটা সবপ্রথম চোখ থেকে ঘুম তাড়ালেও সবার আগে কিন্তু সে মাটিতে নামল না। ভোরবেলার প্রথম পতঙ্গ-শিকারের দাবিটা হল হিমালয়ের গানের পাখি দোয়েলের। কুমায়ুনের বনে বনে দিন-রাত্রির বা রাত্রি-দিনের আধো-আলো-আঁধারির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যাবে কোন পাখি হয়ত নিঃশব্দ পাখায় ভর করে গানের সোনালি ঝরনা বইয়ে দিল,—সে গান একবার শুনলে আর কোনদিন ভোলবার নয়। চলে-যাওয়া দিনকে বিদায় দিয়ে সে নবজাতক নতুন দিনকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সকাল-সন্ধ্যা সে উড়তে উড়তে গান গাইতে থাকে, আর দিনের বেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন পত্রবহুল গাছে বসে মিষ্টি স্বরে নিচু গলায় এমন এক গান ধরে যার না আছে শুরু না আছে সমাপ্তি। তার পরে দিনের আলোকে স্বাগত জানায় কোন ভিমরাজ, আর তার মিনিটখানেক পরেই কোন ময়ূর। বিরাট শিমুল গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে এই তীক্ষ্ণ ডাক ওঠে, এবং তার পরে আর কোন পাখির পক্ষেই ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। আর এই সময়ে, যখন রাত চলে যাচ্ছে আর ভোর হচ্ছে, শত-শত কণ্ঠস্বর প্রকৃতির ঐকতানে যোগদান করে ক্রমবর্ধমান সঙ্গীতের পর সঙ্গীতে জঙ্গল মুখর করে তোলে।

আর শুধু পাখিই নয়, জীবজন্তুরাও এখন বেরোতে শুরু করেছে। চিতল

হরিণের ছোট-খাট একটা দল আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। তারও দুশো গজ তফাতে একটা স্ত্রী-সম্বর আর তার বাচ্চা রাস্তার ধারের ছোট ছোট ঘাস খেয়ে চলেছে। এবার পুব দিক থেকে একটা বাঘ ডেকে উঠল, আর যেসব ময়ূর তা শুনতে পেল সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। কুঁয়র সিং-এর ধারণা বাঘটার দূরত্ব বন্দুকের গুলির পাল্লার চার গুণ,—এ হল সেই বালিভরা নালা যেখানে তার আর হর সিং-এর সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার ফলাফল মারাত্মক হয়ে উঠে। বোঝা গেল বাঘটা কোন মড়ি থেকে ফিরছে, তাই সে পরোয়া করে না কে তাকে দেখল বা না দেখল। প্রথমে একটা রুরু হরিণ, তারপর দুটো সম্বর, আর এখন একপাল চিতল বনের বাসিন্দাদের তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে লাগল। আমরা যখন গারুপ্পু পৌঁছলাম রোদ তখন গাছের আগায়। তারপর কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে, গোটা পঞ্চাশ ষাট বন-মোরগ চরছিল তাদের চমকে দিয়ে আমরা একটা পায়ে-চলা পথ ধরে অগ্রসর হলাম—একটা সরু ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এ পথ সেই শুকনো জলপথে গিয়ে পড়েছে যেটার উপরকার সাঁকো আমরা এইমাত্র পার হয়ে এলাম। এই জলপথে প্রবল বর্ষার সময়ে ছাড়া কোন ঋতুতেই জল থাকে না। বনের সকল প্রাণীর এটা রাজপথ;—তিন মাইল নিচে যেখানে স্বচ্ছ জলের ঝরনাটার উৎস সেখানে সকল প্রাণীই যায় এই পথে তৃষ্ণা দূর করতে। পরবর্তীকালে এই জলপথ আমার রাইফেল ও ক্যামেরার একটি প্রিয় শিকার-স্থল হয়ে উঠেছিল,—কারণ যে অঞ্চল দিয়ে এটা চলে গেছে সেখানে শিকার অজস্র; সেখানে বালির উপর মানুষের পায়ের চিহ্ন ততটাই গবেষণার ব্যাপার, রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে ফ্রাইডের পায়ের ছাপ যতটা।

আধ-মাইলটাক ঝোপ-জঙ্গল দিয়ে চলে যাবার পর এই জলপথ সিকি মাইল চওড়া আর মাইলের পর মাইল লম্বা একখানি নলবনের মধ্যে প্রবেশ করে। নল-ঘাস হল ফাঁপা, বাঁশের মত গাঁট গাঁট তাতে। উঁচুতে এগুলো হয় চোদ্দ ফুট পর্যন্ত। যেখানে এ বস্তু গ্রামের ধারে-কাছে পাওয়া যায় সে অঞ্চলে গ্রামবাসীরা কুটির নির্মাণের কাজে এর প্রচুর ব্যবহার করে। গরু-ভেড়ার চারণভূমির জন্যে যখন গ্রামবাসীরা গারুপ্পুর আশে-পাশের জঙ্গল পুড়িয়ে দেয়, এ অঞ্চলের সমস্ত প্রাণী তখন গিয়ে নল-ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, কারণ জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে বলে এখানকার নল-ঘাস সারা বছর সবুজ থাকে। কোন-কোন বছরে অবশ্য বর্ষা যখন অত্যন্ত কম হয় তখন আগুন ধরে যায় এই নল-বনেও, এবং তা থেকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়, কারণ ঘাসের সঙ্গে এখানে লতাপাতা জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকে। আর নল-ঘাসের প্রতিটি গাঁট যখন আগুন লেগে ফেটে পড়ে

তখন আওয়াজ হয় বন্দুকের গুলির মত, এবং যখন কোন-কোন গাঁট একসঙ্গে ফাটতে শুরু করে তখন যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা কানে তালা ধরিয়ে দেবার মত; সে শব্দ শোনা যায় এক মাইলেরও বেশি দূর থেকে।

সেদিন সকালে কুঁয়র সিং-এর সঙ্গে জলপথটা ধরে এগোতে এগোতে দেখি, কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূর থেকে আগুনের শব্দ আর নল-বন থেকে গাঁট ফাটার শব্দ আমার কানে এল। জলপথটা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে, আর আগুনটা, যেটা ছিল পুব বা বাঁ পারে, জোর বাতাসে সেদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কুঁয়র সিং আগে আগে যাচ্ছিল, সে বললে দশ বছর পরে আজ নল-বনে আগুন লাগল। সিধে এগিয়ে চলল সে। একটা বাঁকে মোড় ফিরতে আমাদের আগুনের দেখা মিলল—জল-পথের থেকে শ-খানেক গজ দূরে সেটা। আগুনের বিরাট বিরাট শিখা কালো ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে; যে সব উড়ন্ত পোকা গরম হাওয়ার তাপে পাক খেতে খেতে উপরে উঠে যাচ্ছে, অসংখ্য ময়না, নীলকণ্ঠ আর ফিঙে তাদের খেয়ে চলেছে। যে-সব পোকা পাখিদের কবল থেকে রক্ষা পেল তাদের অনেকে জলপথের বালিভরা গর্ভে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর আর বনমোরগ আর কালো তিতির তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইসব শিকারের পাখিদের মধ্যে গোটা-কুড়ি চিতলের একটা পাল বিরাট শিমুল গাছটার ঝরে-পড়া শাঁসালো ফুলগুলো খেতে লাগল।

দাবানলের অভিজ্ঞতা জীবনে এই আমার প্রথম, এবং এ থেকে যে ভয় আমি পেলাম সে ভয় অজানার ভয়, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই তা বর্তমান। তারপর যখন মোড় ফিরে দেখলাম কত পাখি পশু এই আগুনের কাছেই চরে বেড়াচ্ছে এবং কিছুমাত্র ভয় পাচ্ছে না, তখন বুঝলাম যে একমাত্র আমিই ভয় পেয়েছি, এবং সে ভয়ের একমাত্র কারণ, অভিজ্ঞতার অভাব। কুঁয়র সিং-এর সঙ্গে জলপথের পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল পিছু ফিরে দৌড়ে পালাই, কিন্তু পাছে সে আমায় কাপুরুষ মনে করে এই ভয়ে তা থেকে বিরত হলাম। আর এখন এই পঞ্চাশ গজ চওড়া শুকনো জলপথের বালিভরা বুকে দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে-আসা আগুনের ক্রমবর্ধমান গর্জন আর মাথার উপরে ধোঁয়ার কালো মেঘ লক্ষ্য করতে করতে, নল-ঘাসের ওদিক থেকে কোন শিকারের প্রাণীর আসার প্রতীক্ষায় থেকে সেই যে আমার ভয় দূর হল, আর তা ফিরে আসে নি। জলপথের যেখানে আমরা আছি আগুনের তাপ সেখান পর্যন্ত আসছে। দেখলাম হরিণ, ময়ূর, বন-মোরগ আর কালো তিতির জলপথের ডান পাড় বেয়ে উঠে জঙ্গলের

মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

পরবর্তী জীবনে দাবানল থেকে আমার প্রচুর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়। তার একটার বর্ণনা দেবার আগে জানানো দরকার যে আমরা যারা হিমালয়ের পাদদেশে চাষবাসের কাজ করি, অসংরক্ষিত বনের ঘাসে আগুন দিয়ে তাকে চারণভূমিতে পরিণত করার অধিকার গভর্মেণ্ট থেকে পেয়েছি। এসব বনে অনেক রকম ঘাসের প্রাদুর্ভাব, এবং সব রকম ঘাসই সমান শুকনো না হওয়ায় এই আগুন ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায়,—ফলে ফেব্রুয়ারিতে যার শুরু, তা শেষ হয় জুনে। এই ক-মাস ধরেই এসব ঘাসের বনে আগুনের দেখা মেলে; ফলে কোন জায়গার ঘাস শুকনো মনে হলে ইচ্ছে করলেই তাতে দেশলাই ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

তখন আমি উইলিয়মের সঙ্গে তরাইয়ের বিন্দুখেরায় কালো তিতির শিকার করছি। একদিন সকালে আমি আর বাহাদুর পঁচিশ মাইল হাঁটা-পথ ধরে কালাঢুঙ্গিতে আমাদের বাড়ির দিকে চললাম। এই বাহাদুর হচ্ছে আমাদের বহু দিনের বন্ধু,—ত্রিশ বছর ধরে সে আমাদের গ্রামের মোড়ল। প্রায় দশ মাইল আমরা যে জমির উপর দিয়ে চললাম তার বেশির ভাগ ঘাসই পুড়ে গেছে, মাঝে মাঝে কেবল কোথাও কোথাও খানিকটা করে রয়ে গেছে। আমরা অগ্রসর হতে একটা প্রাণী এইরকম একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল, তারপর যে গরুর গাড়ির পথ দিয়ে আমরা চলেছি সেখানে এসে দীর্ঘ এক মিনিট কাল আমাদের দিকে পাশ করে দাঁড়াল। সকালের রোদে তার গায়ের রঙ আর আকৃতি দেখে তাকে বাঘ বলেই মনে হল। কিন্তু পথটা পেরিয়ে ঘাস-জমিতে প্রবেশ করতে তার ল্যাজের সাইজ থেকে বোঝা গেল যে সে একটা চিতাবাঘ। দুঃখের সঙ্গে বাহাদুর বলল, 'সাহেব, বড়ই আপশোসের কথা যে কমিশনার সাহেব এখন তাঁর হাতিদের নিয়ে দশ মাইল দূরে; কারণ তরাই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চিতাবাঘ হল এটা,—শিকারের যোগ্য প্রাণী।' শিকারের যে যোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই, উইলিয়াম আর তাঁর দলবল দশ মাইল দূরেই থাকুন আর যেখানেই থাকুন। আমি ঠিক করলাম একবার চেষ্টা করে দেখব, কারণ চিতাবাঘটা গোশালার দিক থেকে আসছে, আর এ সময়ে যখন সে এই ফাঁকা জায়গাটায় ঘুরছে ফিরছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে গতরাত্রে সে সেখানে কোন প্রাণী মেরেছে। ঘাস-বনে আগুন লাগিয়ে চিতাবাঘটাকে তাড়িয়ে আনবার মতলব বাহাদুরকে জানাতে সে বললে সে আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এও জানালো যে এতে সাফল্য সম্বন্ধে তার সন্দেহ আছে। প্রথমে দেখতে হবে ঘাস-জমিটা কত বড়; তাই রাস্তা

থেকে নেমে আমরা খানিকটা ঘুরে গেলাম। দেখলাম এটা দশ একরের মত বড় আর এর একটা দিক কোণের আকৃতির,—গরুর গাড়ির পথটা কোণের উল্টো দিক দিয়ে চলে গেছে।

বাতাস ছিল আমার অনুকূলে; তাই ঘাস-জমির অপর দিকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে—পথটা থেকে সেটার দূরত্ব দুশো গজের মত—আমি দু-গোছা ঘাস কেটে নিয়ে বাহাদুরের হাতে দিয়ে বললাম ডান দিকের ঘাস-বনে আগুন দিতে, আর আমি নিজে বাঁ দিকের হোগলা-বনে আগুন লাগালাম। উচ্চতায় এরা বারো ফুট পর্যন্ত হয়, আর জ্বালানি কাঠের মত শুকনো খটখটে হয়ে থাকে। ফলে আগুন লাগাবার এক মিনিটের মধ্যেই ভয়ঙ্করভাবে জ্বলতে শুরু করল। তারপর আবার পথটার উপর দৌড়ে গিয়ে সেখানে শুয়ে পড়লাম, তারপর '২৭৫ রিগ্‌বি রাইফেলটা কাঁধে করে রাস্তাটার ওপারে একটা সুবিধেমত উঁচু জায়গা বেছে নিলাম যেখান থেকে গুলি করলে রাস্তার দিকে ধেয়ে আসা চিতাবাঘটার গায়ে লাগতে পারে। ঘাস-বন থেকে আমার দূরত্ব দশ গজের মত, আর চিতাবাঘটা যেখানে ঢুকেছে সে জায়গাটা আমার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। রাস্তাটা দশ ফুট চওড়া। চিতাবাঘটাকে গুলি করার একমাত্র সুযোগটা আসবে যে মুহূর্তে আমি সেটাকে দেখতে পাব, কারণ আমি জানি একেবারে শেষ মুহূর্তে সে রাস্তাটা পার হবে, প্রচণ্ড বেগে। বাহাদুরের কোন আঘাতের আশঙ্কা নেই, কারণ তাকে নির্দেশ দিয়েছি ঘাসে আগুন দিয়েই রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরের একটা গাছে উঠে পড়তে।

অর্ধেকটা ঘাস-বন পুড়ে গেল,—আগুন থেকে যে শব্দটা শোনা যাচ্ছে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় কোন সেতুর উপর দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের চলে যাওয়ার শব্দের। হঠাৎ আমার ডান কাঁধের কাছে মানুষের একটা খালি পা দেখা গেল। তাকিয়ে দেখি, একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে,—পোশাক দেখে বুঝলাম সে এক মুসলমান গাড়োয়ান. হয়ত কোন হারানো গরুর খোঁজ করছে। আমি তাকে টেনে আমার কাছে নামিয়ে আনলাম, তারপর তার কানে চিৎকার করে বললাম একেবারে চুপচাপ আমার কাছে শুয়ে পড়তে, আর পাছে সে আমার কথা না শোনে তাই আমার দুটো পা তুলে দিলাম তার শরীরের উপর। এগিয়ে আসছে আগুন। যখন ঘাস-বন আর মাত্র পঁচিশ গজের মত অবশিষ্ট, এমন সময় চিতাবাঘটা তীরবেগে রাস্তাটা পার হল। আমি ঘোড়া টিপতেই তার ল্যাজটা উঁচু হয়ে উঠল। অবশ্য যেভাবে তার ল্যাজটা উপর দিকে উঠে গেল তাতে সে আঘাত যে মারাত্মক হয়েছে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। তারপর শক্ত

করে লোকটার হাত ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিলাম তাকে, তারপর তাকে নিয়ে সেই রাস্তা ধরে ধোঁয়ার ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে দৌড়তে লাগলাম ; ধোঁয়ার মধ্যে এগিয়ে-আসা আগুনের শিখা আমার মাথার উপর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। চিতাবাঘটা যখন আমার চোখে পড়ল তখন আমরা প্রায় তার উপর গিয়ে পড়েছি। একটুও সময় নষ্ট না করে—কারণ এখানকার উত্তাপ অসহ্য—আমি ঝুঁকে পড়লাম, তারপর লোকটার একটা হাত চিতাবাঘটার ল্যাজের উপর দিয়ে আমার নিজের হাত দিয়ে সে হাতটা টিপে ধরলাম। তারপর আগুনের কাছ থেকে সেটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যেই টানতে শুরু করেছি অমনি মহা আতঙ্কের সঙ্গে শুনলাম, চিতাবাঘটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। ভাগ্য ভাল যে আমার গুলি তাব কাঁধ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়ে তাকে অবশ করে দিয়েছিল। পঞ্চাশ গজের মত টেনে আনতে না আনতেই মারা পড়ল চিতাবাঘটা। হাতটা ছেড়ে দিতেই লোকটা এক লাফে এমনভাবে আমার কাছ থেকে পালাল, যেন আমি তাকে কামড়ে দিয়েছি! তারপর পাগড়িটা মাথা থেকে খুলে যে দৌড় সে দৌড়ল কোন গাড়োয়ান কখনো তেমন দৌড়য় নি। পাগড়িটা তার পেছনে লুটোতে লুটোতে চলল।

ও যখন ওর গন্তব্য স্থানে পৌঁছয় (জানি না সে কোথায়) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না বলে আমার আপশোস হচ্ছে। কাহিনীর বর্ণনার ব্যাপারে ভারতীয়েরা অত্যন্ত ওস্তাদ, সুতরাং, এক পাগল ইংরেজের কবল থেকে তার উদ্ধার পাওয়ার এই কাহিনী রীতিমত উপভোগ্য হয়ে উঠত। গাছের উপর থেকে বাহাদুর সমস্ত ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিল, আমার কাছে এল সে। বললে, 'বহু বছর ধরে এখন গল্পের আসরে ওর জনপ্রিয়তা বজায় থাকবে, যদিও অবশ্য সে-গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।'

এ-হেন ভয়ঙ্কর প্রাণীর কাছে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি করার পক্ষে যখন পরিস্থিতি অনুকূল হয় না তখন সাধারণত হাতির, না হয় লোকজনের সাহায্যে কিংবা এই দুই উপায়ই একসঙ্গে অবলম্বন করে তাকে বন থেকে তাড়িয়ে বার করা হয়ে থাকে। এ-হেন উপায়ে শিকার তাড়িয়ে আনার তিনটি অভিজ্ঞতা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে যা লিপিবদ্ধ করার যোগ্য। আর কিছু না হোক শুধু এই কারণে যে, দুটি ক্ষেত্রে মানুষ ছিল যথাসম্ভব অল্প, আর তৃতীয় অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলে আজও আমার দু-একটা হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম বাঁক

আমাদের শিকারী কুকুর রবিনকে নিয়ে আমি একদিন সকালে দাবানল-পথ ধরে বোয়র নদীর পোলের পশ্চিমে আধমাইলটাক অগ্রসর হয়েছি, রবিন চলেছে আমার আগে-আগে। এই চলা-পথে খানিকটা এগোতে এক জায়গায় ঘাস ছোট-ছোট হয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে সে থেমে দাঁড়াল; ঘাস শুঁকল, তারপর মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার কাছে গিয়ে দেখি, আর পথ নেই; তাই আমি তাকে ইঙ্গিতে বললাম গন্ধ অনুসরণ করে এগোতে। তখন সে দৃঢ়ভাবে বাঁ দিকে ফিরল, তারপর পথের ধারে যেখানে একটুকরো ঘাস-জমি আছে সেখানে পৌঁছে নাকটা একবার উপরে আর একবার নিচে করে, চকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল,—যেন বলতে চায় যে সে ঠিক চলেছে, পথ ভুল করে নি। তারপর সেখানকার আঠারো ইঞ্চি উঁচু ঘাস-বনের মধ্যে ঢুকল। গন্ধ অনুসরণ করে এক ফুট এক ফুট করে সে এগোতে লাগল। এভাবে একশো গজ মত অগ্রসর হবার পর একটা স্যাঁতসেঁতে নিচু জায়গায় পৌঁছে দেখলাম যে সে একটা বাঘের পিছু নিয়েছে। এই জায়গাটার ওপারে পৌঁছে রবিন খুব মনোযোগের সঙ্গে একটুকরো ঘাস পরীক্ষা করে দেখল। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম খানিকটা রক্ত সে আবিষ্কার করেছে। অন্য শিকারীর গুলিতে আহত প্রাণী দেখে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে কোন বাঘের চলা-পথে রক্ত দেখলেই আমি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা অনেকটা সহজ, কারণ এ রক্ত খুব টাটকা, এবং আজ সকালে যখন এ অঞ্চলে কোন বন্দুকের শব্দ শোনা যায় নি তখন আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে বাঘটা নিশ্চয় তার কোন শিকারকে বয়ে নিয়ে চলেছে—হয়ত কোন চিতল, কিংবা কোন বড় শুয়োর হয়ত। আর কয়েক গজ এগোতে লম্বায় চওড়ায় পঞ্চাশ গজ এরকম একটা ঘন ক্লেরোডেনড্রনের ঝোপ দেখা গেল; সেখানে পৌঁছে রবিন থেমে দাঁড়িয়ে এবার আমার নির্দেশের অপেক্ষায় রইল।

নরম মাটিতে পায়ের ছাপ থেকে আমি বাঘটাকে বুঝতে পেরেছিলাম। প্রকাণ্ড বাঘ সেটা,—বোয়র নদীর ওপারের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে সে বাস করছিল। তিন মাস আগে যখন আমরা পাহাড় থেকে নেমে আসি বাঘটা আমার প্রচুর দুর্ভাবনার কারণ হয়েছিল। যে দুটো রাস্তা আর দাবানল-পথ ধরে ম্যাগি আর আমি সকালে বিকেলে বেড়াতাম এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেগুলো চলে গেছে।

আমার অনুপস্থিতিতে বেড়াতে বেরিয়ে ম্যাগি আর রবিন বহুবার এই বাঘের সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং ক্রমেই যেন বাঘটা কম করে ওদের সমীহ করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হল যে রবিনের মনে হল ম্যাগির পক্ষে এ-সব পথ আর নিরাপদ নয়; তাই সে পোলের ওপারে যেতে সরাসরি আপত্তি করল। পাছে কোনদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাই আমি ঠিক করলাম প্রথম সুযোগেই বাঘটাকে গুলি করব, এবং এখন সে সুযোগ উপস্থিত (যদি অবশ্য বাঘটা এখন তার মড়িকে নিয়ে ক্লোরাডেনড্রন ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকে)। রবিন বাঘটার পিছু নিয়েছিল যেদিক থেকে বাতাস বইছিল সেদিক থেকে অগ্রসর হয়ে; তাই অনেকটা ঘুরে আমি তার উল্টো দিক থেকে ক্লেরোডেনড্রন ঝোপটার দিকে অগ্রসর হলাম। যখন আর ত্রিশ গজ বাকি তখন রবিন থেমে দাঁড়াল। বাতাসে মুখ তুলল, মাথাটা কয়েকবার হেঁচকা দিয়ে উঁচু আর নিচু করল, তারপর ফিরল আমার দিকে। হুঁ! বাঘটা তাহলে এখানেই আছে ঠিক। তখন আমরা আবার দাবানল-পথে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বাড়ির পথ ধরলাম।

প্রাতরাশের পর আমি বাহাদুরকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বাঘটার কথা সমস্ত বলে আম আমাদের দুই প্রজা, ধনবান ও ধর্মানন্দকে ডাকতে পাঠালাম। হুকুম তামিল করার ব্যাপারে এবং গাছে ওঠার ব্যাপারে তারা বাহাদুরের আর আমার মতই পারদর্শী। বেলা দুপুর নাগাদ ওরা তিনজন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের কুটিরের সামনে এসে হাজির। প্রথমে পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চয় হলাম য ওদের পকেটে এমন কিছু নেই যাতে শব্দ হতে পারে, তারপর ওদের জুতো খুলতে বললাম। একটা ৪৫০।৪০০ রাইফেল নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিভাবে জঙ্গল পেটা হবে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম। এ জঙ্গল সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান আমার চেয়ে কম নয়; তাই যখন বললাম বাঘটা কোথায় শুয়ে আছে আর আমি ওদের কি কাজের ভার দিচ্ছি, ওদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা দিল। আমার মতলব হল ক্লেরোডেনড্রন ঝোপের তিন দিকে ওদের তিন জনকে তিনটে গাছে তুলে দেওয়া; যে যার জায়গায় থেকে তারা বাঘটাকে উত্তেজিত করবে আর আমি থাকব আর এক দিকে। বাহাদুর থাকবে মাঝের গাছটাতে, আর আমার ইঙ্গিত পেলে (ইঙ্গিতটা হবে চিতাবাঘের ডাকের নকল) সে একটা গাছের ডালে শব্দ করতে থাকবে, আর বাঘটা যদি কোন দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে তার নিকটবর্তী গাছের লোক হাততালি দিতে থাকবে। সাফল্যের জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার চরম নিস্তব্ধতা পালন করা, কারণ প্রত্যেকের থেকেই বাঘটার দূরত্ব হবে ত্রিশ থেকে

চল্লিশ গজ পর্যন্ত, সুতরাং গাছের কাছে যাবার সময়ে, গাছে ওঠবার সময়ে বা সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকবার সময়ে, সামান্যতম শব্দেও মতলবটা পণ্ড হয়ে যাবে।

রবিন যে জায়গায় বাঘটার গন্ধ পেয়েছিল সেখানে পৌঁছে আমি ধনবান আর ধর্মানন্দকে সেখানে বসতে বললাম, আর বাহাদুরকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে উঠতে বললাম। এ গাছটা হল ক্লেরোডেনড্রেন ঝোপ থেকে কুড়ি গজ ভিতরে, আর যেখানে আমি নিজে দাঁড়াব ঠিক করেছিলাম তার উল্টোদিকে। তারপর আমি ঐ দু-জনকে বাহাদুরের ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো গাছে উঠতে বললাম। ওরা তিনজন যেমন পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হল তেমনি ক্লোরোডেনড্রনের ঝোপটাও ওদের প্রত্যেকেরই চোখে রইল এবং সেখানে বাঘটার যে-কোনরকম নড়াচড়া ওদের চোখে পড়ত। কিন্তু লম্বা লম্বা ঘাসের একটা ঝোপ মাঝখানে থাকায় তারা তিনজনেই ছিল আমার দৃষ্টির অগোচর। সবাই নিরাপদে এবং সম্পূর্ণ নিঃশব্দে গাছে ওঠার পর আমি দাবানল-পথে ফিরে গেলাম। সেখান থেকে একশো গজ মত এগোবার পর আর-একটা দাবানল-পথ এই দাবানল-পথটাকে কেটে গেছে; তার একটা দিক দীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে, আর অপর দিকটা চলে গেছে ক্লেরোডেনড্রন ঝোপটার পাশ দিয়ে। বাহাদুর যে গাছটায় ছিল তার পেছনে একটা সরু অগভীর দরিপথ পাহাড়টার পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই দরিপথে শিকারী প্রাণীদের প্রচুর যাওয়া আসা ছিল এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে বাঘটা তাড়া খেলে এই পথেই চলে যাবে। দরিপথের ডানদিকে, পাহাড়টার উপরে দশ গজ মত দূরে একটা বড় জামগাছ। বীট-এর (তাড়া করে জঙ্গলের প্রাণীকে বার করে আনা) পরিকল্পনাটা ঠিক করবার সময় আমি ভেবেছিলাম এই গাছটার উপর বসব, আর বাঘটা আমার পাশ দিয়ে দরিপথ ধরে যেতে গেলেই তাকে গুলি করব। কিন্তু এখন গাছটার কাছে এসে আমি দেখলাম যে এই ভারি রাইফেল হাতে করে আমি গাছে উঠতে পারব না। আশেপাশে তেমন আর কোন গাছ না থাকায় তখন আমি ঠিক করলাম মাটিতেই বসব। এই ঠিক করে আমি গাছটার গুঁড়ি থেকে শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে সেখানে হেলান দিয়ে বসলাম।

চিতাবাঘের ডাক ডাকার আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটো। একটা হল, বাহাদুরকে যে শুকনো লাঠিটা দিয়েছি ইঙ্গিতটা পেয়ে সে সেটা দিয়ে গাছটার ডালে ঘা মেরে শব্দ করতে থাকবে, আর একটা উদ্দেশ্য, বাঘটার পক্ষে যে দাবানল-পথটা পেরিয়ে যাওয়া নিরাপদ এ বিষয়ে তাকে আরও নিশ্চিন্ত করা, আর যদি বা তার মনে কোন সন্দেহ থাকে যে তাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাও দূর করা।

মাটিতে আরাম করে বসবার পর আমি সেফটি ক্যাচটা ঠেলে দিয়ে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলাম, তারপর চিতাবাঘের ডাক ডেকে উঠলাম। কয়েক বার মাত্র শব্দ করেছি, এমন সময় ঝোপটা ফাঁক হয়ে গেল, আর চমৎকার একটা বাঘ সেখান থেকে বেরিয়ে দাবানল-পথের উপর এসে দাড়াল। দশ বছর ধরে আমি একটা বাঘের চলচ্চিত্র তোলার চেষ্টা করে আসছি, এবং বাঘের দেখা বহুবার পেলেও মনের মত ছবি কিন্তু একবারও তুলতে পারি নি। আর এখন এই ফাঁকা জায়গায়, আমার থেকে মাত্র কুড়ি গজ তফাতে বাঘটা, মাঝখানে একটা গাছের পাতায় বা এতটুকু ঘাসে পর্যন্ত কোন কাঁপন নেই। তার চমৎকার শীতের চামড়া রোদে ঝলমল করছে। এ-হেন একটা বাঘের ছবি তোলার জন্যে আমি যে-কোন জায়গায় যেতে বা আমার যা কিছু তাই দিতে প্রস্তুত। অনেকবার এমন হয়েছে যে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো বা দিনের পর দিন কোন জন্তুর পিছু নিয়ে চলেছি, তার পরে সুযোগ পেয়ে বন্দুক তুলেছি, ভাল করে লক্ষ্য স্থির করে বন্দুক নামিয়েছি, তারপর প্রাণীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে হাটটা উঁচু করে তুলেছি আর প্রচুর তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছি তার লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যাওয়া। এ বাঘটাকেও তাই করলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমার মনে হল তা করলে অন্যায় হবে। মাগি বা শের শিং বা যে সব ছোট ছোট ছেলে জঙ্গলে গরু ভেড়া চরাতো বা গ্রামের যে সব স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েরা শুকনো কাঠ কুড়োতে আসত কেবলমাত্র তাদের কথা চিন্তা করেই নয়, যেরকম ভয়ঙ্করভাবে বাঘটা চলা-ফেরা করত, তাতে যদিও সে তখন পর্যন্ত কোন মানুষ মারে নি, যে কোন সময়ে তেমন দুর্ঘটনা ঘটে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

দাবানল-পথের উপর এসে পৌঁছে বাঘটা দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে তাকাল, তারপর কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল যেদিকে বাহাদুর ছিল সেদিকটায়। তারপর সে অলসভাবে রাস্তাটা পার হয়ে দরিপথের বাঁ দিক দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। ক্লেরোডেনড্রন ঝোপের ফাঁক দিয়ে সে যখন বের হয় তখন থেকেই আমার চোখ তার উপর ছিল, যে মুহূর্তে সে আমার সঙ্গে এক লাইন হল, আমি ঘোড়া টিপে দিলাম। আমার মনে হয় না সে গুলির শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পেয়েছে,—তার পাগুলো পেটের নিচে কুঁকড়ে গেল, পেছন দিকে হটে এসে সে আমার কাছে স্তব্ধ হয়ে রইল।

দ্বিতীয় বাঁক

জিন্দের মহামান্য মহারাজা মারা গেলেন। তাকে অনেক বয়স হয়েছিল, সকলের ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত তার একজন শ্রেষ্ঠ শিকারীকে হারাল। তার রাজত্বের বিস্তার ছিল ১২৯৯ বর্গ-মাইল আর তার লোকসংখ্যা ৩২৪ ৭০০। রাজস্বও উঠত চমৎকার। মহারাজার মত অমন সাধাসিধে মানুষ আমি আর দেখি নি। তাঁর শখ হল শিকারী কুকুরদের শিক্ষা দেওয়া আর বাঘ শিকার করা, এবং এই দুটি ব্যাপারেই তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল কি না সন্দেহ। প্রথম যখন তার সঙ্গে আলাপ হয় তখন তিনি বাচ্চা কুকুরদের শিক্ষা দান করতেন. এবং পরবর্তীকালে মাঠে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাতেন। তাঁকে ধৈর্য ও কোমলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে ধরা যেতে পারে, দেখে দেখে আমার ক্লান্তি আসত না। কেবলমাত্র একবার আমি মহারাজাকে গলার স্বর তুলতে বা কোন কুকুরকে শাস্তি দিতে চাবুকের ব্যবহার করতে দেখেছি। সেদিন রাত্রে নৈশাহারের সময় মহারানী যখন জিজ্ঞাসা করলেন কুকুরগুলো ভালভাবে চলেছিল কি না, মহারাজা উত্তরে বললেন, 'না, স্যাণ্ডি বড় অবাধ্য হয়েছিল, তাই তাকে একটু উত্তম-মধ্যম লাগাতে হয়েছিল।'

মহারাজা আর আমি সেদিন পাখি শিকারে বেরিয়েছি। একটা প্রশস্ত ঘাস-জমি আর ঝোপ জঙ্গল বীট করে মানুষ আর হাতি একসার হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এটার পরে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া খানিকটা জমি। মহারাজা আর আমি এই জমিটার অপর পারে কয়েক গজ তফাতে আছি,— আমাদের পেছনে ছোট ছোট ঘাসের জঙ্গল। মহারাজার বাঁ দিকে লাইনে বসে তিনটে অল্পবয়স্ক ল্যাব্রেডর কুকুর—তাদের মধ্যে স্যাণ্ডি হল সোনালি রঙের, বাকি দুটো কালো। একটা কালো তিতির ওরা তাড়িয়ে আনতে মহারাজা সেটাকে গুলি করে ফাঁকা জায়গাটার উপর নামালেন আর ঐ কালো কুকুর-দুটোর একটাকে পাঠালেন সেটাকে আনবার জন্যে। এরপর একটা বন-মোরগ আমার মাথার নিচ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি গুলি করতে সেটা পেছনদিকের ঘাস-জমিতে পড়ে গেল। এটাকে নিয়ে এল দ্বিতীয় কালো কুকুরটা। কয়েকটা বন-মোরগ উপরে উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু সামনের দিক থেকে দুটো গুলির আওয়াজ শুনে বাঁ দিকে মোড় ফিরে রাইফেলের পাল্লার বাইরে চলে গেল। তারপর একটা

খরগোস ঝোপ থেকে বেরোল, কিন্তু মহারাজাকে দেখেই নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা ডানদিকে ফিরে আমার সামনে এসে পড়ল—মহারাজা তখন পেছন ফিরে একজন ভৃত্যের সঙ্গে কথা কইছিলেন। যখন খরগোসটা একেবারে নাগালের সীমানার কাছে গেল তখন গুলি করলাম, কারণ অল্পবয়স্ক কুকুরের সামনে যেটুকু নিতান্ত দরকার তার বেশি শিকার করা উচিত নয়। গুলি খেয়েই প্রথমে উল্টে পড়ল খরগোসটা, তারপর আমাদের দু-জনের সামনে দিয়ে মহারাজার ডানদিকে ত্রিশ গজটাক গিয়ে পড়ে গেল। সে পড়ে যেতেই স্যাণ্ডি তীব্রবেগে ছুটল। 'স্যাণ্ডি, স্যা-ন্‌ডি!' চিৎকার করলেন মহারাজা। কিন্তু স্যাণ্ডি কারুর কোন কথাই শুনতে রাজি নয়। তার দুই সঙ্গী দুটো পাখি এনেছে, সুতরাং এবার নিশ্চয় তার পালা, কোন বাধাই মানতে রাজি নয় সে। ছুটতে ছুটতেই সে খরগোসটাকে ধরল আর তেমনি ছুটতে ছুটতে এসে সেটা আমার হাতে দিল। তারপর মনিবের কাছে ফিরে গিয়ে বসল নিজের জায়গায়। তখন খরগোসটা নিয়ে আসার হুকুম পেতে, সেখানে আমি খরগোসটা রেখেছিলাম সেখান থেকে সেটাকে তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরে স্যাণ্ডি মহারাজার কাছে গেল। কিন্তু মহারাজা তাকে দূরে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন—আরো—আরো দূরে, ডানদিকে আরো দূরে,—যতক্ষণ না যেখান থেকে সে খরগোসটা নিয়ে এসেছিল সেখানে পৌঁছচ্ছে। এখানে খরগোসটা রেখে তাকে ফিরে আসতে ইঙ্গিত করা হল। আবার স্যাণ্ডি তার মনিবের কাছে ফিরে এল,—তার ল্যাজ নিচু হয়ে গেছে, দু-কান ঝুলে পড়েছে। তখন আর-একটা কুকুরকে পাঠানো হল খরগোসটা নিয়ে আসতে। খরগোসটা আনা হলে মহারাজা বন্দুকটা একজন চাকরের হাতে দিলেন, তারপর তার হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে এক হাতে স্যাণ্ডির ঘাড়ের পেছনটা ধরে প্রচুর প্রহার করলেন। প্রহারটা প্রচুর হল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা স্যাণ্ডির পক্ষে নয়,—কারণ তার উপর আঘাত পড়ল না, দু-দিকে মাটির উপর। মহারাজা যখন স্যাণ্ডির অপরাধ আর তার শাস্তির কথা মহারানীকে বলছিলেন সেই সময় আমি এক ভৃত্যের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে তাতে লিখলাম (কারণ মহারাজা ছিলেন একেবারে বধির), 'স্যাণ্ডি বাহাদুর আজ আপনাকে অমান্য করেছে বটে, কিন্তু তবুও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কুকুর সে; দেখবেন শিকারী কুকুরদের পরবর্তী প্রতিযোগিতাতেই সে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।' সেই বছরেই পরবর্তীকালে আমি একটা টেলিগ্রাম পাই, তাতে লেখা—'আপনি ঠিকই বলেছেন। স্যাণ্ডি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে।'

ক্রমেই দিন বড় হতে থাকল, রোদের তেজও বাড়তে লাগল, তাই একদিন

খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ে আমি দশ মাইল পথ হেঁটে যখন মোহনলে মহারাজার তাঁবুতে এসে পৌঁছলাম ওঁরা তখন প্রাতরাশে বসেছেন। 'বড় ভাল সময়ে এসেছেন' আমি টেবিলে বসতে তিনি বললেন 'কারণ আজই আমরা সেই বুড়ো বাঘটাকে মারতে চলেছি, তিন বছর ধরে যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে আসছে।' এই বাঘের কথা আমি অনেকবার শুনেছি, তাই আমি জানতাম একে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে গুলি করার ব্যাপারে মহারাজার কত উৎসাহ। তাই যখন মহারাজা তিনটে মাচানের সবচেয়ে ভালটায় আমায় বসতে বললেন এবং একটা রাইফেলও ধার দিলেন, আমি রাজি হলাম না, বললাম, তার চেয়ে বরং আমি দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করব। দশটার সময় মহারাজা, মহারানী, তাঁদের দুই মেয়ে আর এক বান্ধবী আর আমি মোটরে করে, যে পথে আমি হেঁটে এসেছি সেই পথে চললাম যেখানে বন বীট করার জন্যে তারা আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

যে জমিটা বীট করা হবে সেটা একটা উপত্যকা পাহাড়ের পাদদেশে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে, আর একটা ছোট নদী তার ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে, তার দুই তীরে তিনশো ফুট উঁচু পাহাড়। এর নিচের দিকের সীমানায় যেখানে রাস্তাটা এটাকে কেটে চলে গেছে উপত্যকাটা সেখানে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া, তারপর সাত মাইল দূরে গিয়ে আবার সরু হয়ে পঞ্চাশ গজে দাঁড়িয়েছে। এই দুই জায়গার মাঝামাঝি নদী চওড়ায় তিনশো থেকে চারশো গজ পর্যন্ত, আর এখানে একরের পর একর এলাকা জুড়ে যে ঘন জঙ্গল, তার আড়ালে, আগের দিন যে মোষটা মেরেছিল সেটা নিয়ে বাঘটা লুকিয়ে আছে বলে আন্দাজ করা যাচ্ছে। এই উপত্যকার উপরের সীমানায় পর্বতমালা থেকে একটা ছোট শৃঙ্গ বেরিয়ে ডান দিকে চলে গেছে, এই শৃঙ্গের উপরের একটা গাছে যেখানে মাচান বাঁধা হয়েছে সেখান থেকে উপত্যকাটা আর পাহাড়-গুলোর দু-দিকের নিচু ঢালটা দেখা যায়। এই শৃঙ্গের ওপারে আর নদীটার পরপারে (নদীটা এখানে সোজা ডানদিকে মোড় ফিরেছে) ত্রিশ গজ তফাতে আরো দুটো মাচান তৈরি হয়েছে।

রাস্তার উপর গাড়ি রেখে আমরা পায়ে হেঁটে উপত্যকা ধরে অগ্রসর হলাম। সর্দার-শিকারী, আর যারা বন বীট করছিল তাদের সঙ্গে সেক্রেটারির নেতৃত্বে বাঘটাকে যেখানে আন্দাজ করা হয়েছে সেই জায়গাটার বাঁ-দিকের জঙ্গল ধরে অগ্রসর হলাম আমরা। মহারাজা আর তাঁর বন্দুকবাহক শৃঙ্গের মাচানটায় বসলে চারজন মহিলা আর আমি নদী পার হয়ে ওদিকের দুটো মাচান আশ্রয় করলাম।

সর্দার-শিকারী আর সেক্রেটারি তখন আমাদের ছেড়ে রাস্তায় গেলেন বন ঠেঙানো শুরু করতে।

যে মাচানে আমি আর দুই রাজকন্যা ছিলাম বেশ মজবুত করে বানানো সেটা,—পুরু কার্পেট আর সিল্কের কুশন তাতে। গাছের শক্ত ডালে বসতেই আমি অভ্যস্ত; তার জায়গায় ভোরে উঠে দীর্ঘ পথ চলা আর তারপরে মাচানের এই বিলাসিতা—আমার ঘুম এসে গেল। ঘুমিয়েই পড়তাম, এমন সময় দূর থেকে বিউগলের শব্দ শুনে আমি একেবারে সজাগ হয়ে উঠলাম। বুঝলাম বীট শুরু হয়েছে। বীটের জন্যে আছে দশটা হাতি, সেক্রেটারিরা, এ. ডি. সি.-রা, মহারাজার সংসারের লোকজন, সর্দার-শিকারী আর তার সহকারীরা, আর আশে-পাশের গ্রাম থেকে আসা শ-দুই লোক। উপত্যকার ঘন গাছপালায় ছাওয়া মাটি হাতিরা পায়ে দলে আসবে: তাদের পিঠে রয়েছেন সেক্রেটারিরা ও আরো অনেকে, আর ঐ দুশো লোক দু-দিকের ঢাল ধরে ঠেঙাতে ঠেঙাতে এগিয়ে আসছে। দুই শৈলশিরায় লাইন করে যারা বন ঠেঙাবে এদের কয়েকজন তাদের আগে-আগে যাবে, যাতে বাঘটা বেরিয়ে পড়তে না পারে।

সমস্ত ব্যবস্থা, আর এই ঠেঙানোর ব্যাপারটাও আমার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলজনক হয়ে উঠেছিল, কারণ এমন একটা ব্যাপারে আমি আজ দর্শক যেখানে আমি এ পর্যন্ত সর্বদাই অভিনেতার ভূমিকা নিয়ে এসেছি। ব্যবস্থাপনায় বা ঠেঙানোর কাজে কোথাও কোন ত্রুটি হল না, সময়-নির্বাচনও হয়েছিল চমৎকার, মাচান পর্যন্ত আমাদের যাওয়াটাও হয়েছিল পরম নিঃশব্দে, আর ঠেঙানোর কাজ যে ভালভাবেই হচ্ছিল তার প্রমাণ, অসংখ্য পাখি, কালিজ, বন-মোরগ, ময়ূর সব উড়তে শুরু করেছিল। ঠেঙানো ব্যাপারটায় সব সময়েই প্রচুর উত্তেজনার খোরাক থাকে, কারণ বাঘের বেরোবার সম্ভাবনা থাকে ষোল আনা। মহারাজা বধির বলে খানিকটা অসুবিধে ছিল বটে, কিন্তু তাঁর পাশে একজন ওস্তাদ রয়েছে, দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লোকটি ইঙ্গিত করে ডানদিকে কি দেখিয়ে দিচ্ছে। দু-এক মুহূর্ত সেইদিকে তাকিয়ে থেকে মহারাজা ঘাড় নাড়লেন। আর একটু পরেই একটা পুরুষ সম্বর নদী পেরিয়ে এল, আর মহারাজার গন্ধ পেয়েই আমাদের পাশ দিয়ে সবেগে উপত্যকা বেয়ে উঠে গেল।

শৈলশিরার বাঁদিকে যারা লাইন করে অগ্রসর হচ্ছিল এখন তারা দৃষ্টিগোচর হল, বাঘটার বেরিয়ে আসার সময় হল এবার। এগিয়ে এল ঠেঙিয়ের দল, চেঁচিয়ে, হাততালি দিয়ে সবাই যোগ দিল তাতে। এক গজ এক গজ করে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগল আমার মনে হল যে মহারাজার গুলি করার সম্ভাবনা

ততই কমে যাচ্ছে, কারণ কোন পাখির বা কোন পশুর কোন সতর্কতাসূচক আওয়াজ আমার কানে এল না। আমার মাচানের সঙ্গিনীরা নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে, মহারাজা রাইফেল উদ্যত করে রয়েছেন কারণ বাঘটা এখন বেরিয়ে এলে খুব তাড়াতাড়ি তাকে গুলি করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল রাইফেল আজ কোন কাজেই লাগবে না, কারণ বাঘটাই নেই এ অঞ্চলে। মই লাগানো হল, অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে সবাই নেমে এলেন মাচান থেকে। নেমে এসে যাদের সঙ্গে মিলিত হলেন তাদের হতাশা আরও বেশি। ঠেঙিয়েদের মধ্যে কেউ বাঘের দেখা পায় নি, তারা বুঝল না কোথায় কী গলদ হয়েছে। তবে, কোথাও যে একটা কিছু ভুল হয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারণ গাড়ি করে এসে পৌঁছবার অল্প আগেই উপত্যকা থেকে বাঘের আওয়াজ শোনা গেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি আন্দাজ করতে পারছি কেন আমাদের ব্যর্থ হতে হল; কিন্তু আমি আজ দর্শক মাত্র, তাই আমি কোন কথাই বললাম না। বনভোজন সেরে তাঁবুতে ফিরলাম আমরা। সবাই যখন বিশ্রাম করছে তখন কোশী নদীতে গিয়ে মাছ ধরে সময়টা চমৎকার কাটল, কারণ সময়টা হল এপ্রিলের শেষার্ধ, মাছ ধরার সেরা সময় এখন।

ডিনারে বসে, এবং ডিনারের পরেও, সেদিনকার ব্যর্থতার আর আগের পাঁচটা বীটের ব্যর্থতার খুঁটিনাটি আলোচনা করা হল এবং তার কারণ অনুসন্ধান করা হল। প্রথমবার যখন এই বাঘটারই সন্ধানে বীটের ব্যবস্থা হয় বাঘটা তখন মহারাজার ডান দিকে দেখা দেয় এবং মোটেও না নড়তে পারার ফলে মহারাজা যে গুলি করেন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর পরের বীটগুলি অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে। কোনবারই দেখা যায় নি বাঘটাকে, যদিও বীট শুরু হবার সময় সে সেখানে ছিল বলে জানা গেছে। আর সকলে যখন মহারাজার খাতিরে কথাবার্তা কইছিল আর কাগজে লিখে মহারাজাকে দেখাচ্ছিল আমি তখন চিন্তায় ডুবে রইলাম। মহারাজা ভাল শিকারী, সুতরাং যদি আমি বাঘটা মারার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারি তো সে চেষ্টা আমার করা উচিত। ভুল হয়েছে সেদিন, যেখানে বাঘটা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সে-জায়গার সামনে দিয়ে মহারাজার সদলবলে যাওয়া; কিন্তু বীটের অসাফল্যের কারণ সেটা হতে পারে না, কারণ বীট যে সময়ে শুরু হয় প্রায় সেই সময়েই বাঘটা চলে যায় ওখান থেকে। মোটর কার থেকে বেরোবার কিছুক্ষণ পরে রুরু হরিণটার যে সাবধান-বাণী শোনা গিয়েছিল, তা থেকেই এই সন্দেহটা আমার মনে জেগে ওঠে। পরে যখন জানা গেল যে বীটের জঙ্গলে বাঘ নেই তখন আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম জঙ্গল থেকে বেরোতে হলে বাঘটার মাচানের সামনে দিয়ে ছাড়া পালাবার

আর কোন পথ ছিল কি না। মাচানগুলোর পেছনদিককার শৈলশিরা থেকে শুরু হয়ে একটা ধ্বস একেবারে উপত্যকার নিচে পর্যন্ত চলে গেছে। এই ধ্বসের উপরটা থেকে ডেকে উঠেছিল রুরুটা. বাঘটা যেখানে তার মড়ি রেখেছিল এখান থেকে সেই জায়গা পর্যন্ত যদি কোন পশু-চলার পথ থাকে তাহলে হয়ত প্রতিবারেই বীটের ব্যবস্থার সাড়া পেয়ে বাঘটা এই পথ ধরে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে।

সবাই যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত সে সময়ে এই মতলবটা আমার মাথায় ঘুরছিল যে রুরুটা যেখানে ডেকে উঠেছিল মহারাজাকে শৈলশিরার উপর সেখানে থাকতে বলা, আর বাঘটাকে তাড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া। ঠিক পরের দিনই আবার বাঘটার জন্যে বীটের ব্যবস্থা করার কথায় সবাই আপত্তি করে উঠল, এই যুক্তিতে যে, টাটকা টোপেই যখন বাঘটা এল না যখন বাসি টোপে তাকে পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। তবে, আমার মতলব যদি ব্যর্থও হয় তাহলেও ক্ষতি নেই, কারণ সেদিনের জন্যে কোন ব্যবস্থাই করতে হবে না। এক সেক্রেটারির কাছ থেকে কাগজ নিয়ে আমি লিখলাম, 'কাল যদি ভোর পাঁচটার সময় আপনি প্রস্তুত থাকতে পারেন তাহলে এই বাঘটার জন্যে একটা একক বীটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' চিঠিটা মহারাজাকে দিতে তিনি সেটা পড়ে তাঁর সেক্রেটারিকে দিলেন. তারপর সেটা হাতে হাতে সমস্ত ঘরে ঘুরতে লাগল। আমি আপত্তির আশঙ্কা করেছিলাম, এখন উঠল সে আপত্তি। কিন্তু যখন তারা দেখলেন মহারাজা মতলব-মত কাজ করতে রাজি তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্ত কেতার কথা ভুলে রাজি হলেন এবং মাত্র দু-জন বন্দুকবাহকের সঙ্গে মহারাজার শিকার-যাত্রায়ও আপত্তি করলেন না।

ঠিক পাঁচটার সময় মহারাজা, দু-জন বন্দুকবাহক আর আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে করে গেলাম যেখানে হাতিটা একটা ছোট মাচান নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মহারাজাকে আর বন্দুক-বাহকদের হাতিতে তুলে দিয়ে আমি পায়ে হেঁটে সেই সম্পূর্ণ অজানা বনপথ ধরে মাইলের পর মাইল পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম। সৌভাগ্যবশত আমার দিক-জ্ঞানটা ছিল ভাল, তাই অন্ধকারের মধ্যে বেরোলেও আমি মোটামুটি সিধে পথ ধরেই নিয়ে গেলাম। সূর্য যখন উঠছে আমরা তখন শৈলশিরায় যথাস্থানে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে উপত্যকা পর্যন্ত একটা প্রাণী-চলার পথ দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম,—বোঝা গেল এ-পথে বেশ পশুর যাতায়াত আছে। এই পথের কাছে একটা গাছের উপর আমি মাচান বাঁধলাম। মহারাজা আর একজন বন্দুকবাহক মাচানে উঠলে আমি হাতিটাকে ফেরত পাঠালাম, তারপর অপর

বন্দুকবাহকটাকে নিয়ে গিয়ে শৈলশিরা বরাবর খানিক দূরের একটা গাছে তুলে দিলাম। তখন আমি গেলাম একাই বাঘটাকে বীট করতে।

উপত্যকাটা ওখান থেকে অত্যন্ত খাড়া নেমে গেছে,—যেমন খাড়া তেমনি রুক্ষ। কিন্তু সঙ্গে রিভলভারের বালাই না থাকায় নিরাপদে নেমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল। গতদিনের মাচাগুলো নিঃশব্দ পায়ে অতিক্রম করে, যে ঘন ঝোপটার আড়ালে বাঘটাকে আন্দাজ করা হয়েছিল সেটাও পার হয়ে আরও দুশো গজ এগিয়ে গেলাম। এবার আমি ফেরার পথ ধরলাম, আর যেতে যেতে নিচু গলায় নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগলাম। যে জায়গাটায় বাঘটা মোষটাকে টেনে নিয়ে আসে সেখানে একটা বড় কাটা গাছ রয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি এই গাছটার উপর বসলাম,—এই আশায়, যদি জঙ্গল থেকে কোন খবর মেলে। কিন্তু কোন সাড়াশব্দই মিলল না। তখন কয়েকবার কেশে আর কয়েকবার গাছের ফাঁকা গুঁড়িতে জুতো দিয়ে শব্দ করে আমি গেলাম মড়িটার সন্ধানে, আর দেখতে, বাঘটা সেখানে ফিরে এসেছে কি না। দেখলাম সে মড়িটা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে আর মাত্র কয়েক মিনিট আগে তা থেকে খানিকটা খেয়ে ফেলেছে, আর যেখানে সে শুয়ে ছিল সে জায়গাটা তখনও গরম হয়ে রয়েছে। দৌড়ে গাছটার কাছে ফিরে গিয়ে আমি একটা পাথর নিয়ে সেটাকে ঠুকতে লাগলাম আর প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলাম, যাতে মহারাজার সঙ্গী বন্দুকবাহক বুঝতে পারে যে বাঘ আসছে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই একটা বন্দুকের আওয়াজ আমার কানে এল। শৈলশিরায় পৌঁছে দেখলাম, মহারাজা পশু-চলার পথটার উপর দাঁড়িয়ে—যে চমৎকার বাঘটা তিনি মেরেছেন সেটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

জিন্দের প্রাসাদে, এখন সেটা মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দখলে, একটা চামড়া আছে তার নিচে লেখা—'জিমের বাঘ', আর স্বগত মহারাজার শিকারের বইয়ে একটা উক্তি আছে যাতে এই বৃদ্ধ বাঘ শিকারের তারিখ, স্থান আর যেভাবে তাকে মারা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া আছে।

তৃতীয় বীট

এক স্মরণীয় শিকার-অভিযানের শেষ দিন সেটা। স্মরণীয় কেবল আমরা যারা এতে যুক্ত ছিলাম তাদের পক্ষেই নয়, দেশের শাসকদের পক্ষ থেকেও বটে,

কারণ একজন বড়লাট ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কালাঢুঙ্গির জঙ্গলে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্যে এসেছিলেন।

আর কোন মানুষের চলাফেরা বড়লাটের মত অমন কেতাদুরস্ত পথে হয় না, এবং সেই পথ থেকে যে-কোন রকমের বিচ্যুতিই এমন একটা ঘটনা যার কথা কখনো চিন্তা করা হয় নি এবং ফলে যার জন্যে কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তাই যখন লর্ড লিনলিথগো ভারতের বড়লাটের পদ গ্রহণের অল্প পরেই পূর্বসূরীদের অনুসরণ না করে নিজেই এক পথ সৃষ্টি করলেন, তখন স্বভাবতই সারা দেশে বিস্ময়ের বন্যা বয়ে গেল। দিল্লীতে আইন-সভা বন্ধ হওয়ার আর সিমলায় পুনরধিবেশন শুরু হওয়ার মাঝে যে দশ দিন, এ সময়টা ভারতের শাসনকর্তারা দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় কাটাতেন। বহু বছরের এই অভ্যাসে ব্যতিক্রম ঘটায় গভর্মেণ্ট অফিস মহলে যে বাগ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তা দীর্ঘকাল মানুষের মনে থাকবে।

আমি সাধারণ মানুষ, গভর্মেণ্টের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই ছিল না; গভর্মেণ্ট দপ্তরের যন্ত্রের চাকার পর চাকায় যে-সব ব্যাপার ঘটে সে সম্বন্ধে কোন খবর না রেখে দিব্যি আছি। এহেন অবস্থায় সে মাসের শেষের দিকে একদিন আমি আমাদের কালাঢুঙ্গির কুটির থেকে ডিনারের জন্যে মাছ ধরতে বেরোচ্ছি, এমন সময় পিয়ন রাম সিং একটা টেলিগ্রাম নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এল—পোস্টমাস্টার তাকে বলে দিয়েছেন এটা নাকি খুব জরুরি। নৈনিতাল থেকে ফিরে টেলিগ্রামটা কালাঢুঙ্গিতে এসেছে, বড়লাটের সামরিক সেক্রেটারি হিউ স্টেবলের কাছ থেকে। সেক্রেটারি লিখেছেন বড়লাটের দক্ষিণ ভারত সফর বাতিল হয়ে গেছে, তিনি জানতে চেয়েছেন এমন কোন জায়গার আমি নাম করতে পারি কি না যেখানে বড়লাট সিমলা ফেরবার আগে এই দশ দিন কিছু শিকার পেতে পারেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রামটা শেষ হয়েছে—কারণ সময় যেমন কম, ব্যাপারটাও তেমনি জরুরি। রাম সিং ইংরেজি জানত না বটে, কিন্তু ত্রিশ বছর আমাদের কাজ করে করে সে এখন ইংরেজি বুঝতে পারে। আমি টেলিগ্রামটা ম্যাগিকে পড়ে শোনাতে রাম সিং বললে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে খাওয়া সেরে এসে আমার উত্তর নিয়ে হলদোয়ানি চলে যাবে। হলদোয়ানি হল আমাদের সবচেয়ে কাছের পোস্ট আর টেলিগ্রাফ অফিস,—কালাঢুঙ্গি থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। যে ডাক-হরকরা নিয়মিত ডাক নিয়ে যায় তাকে দিয়ে না পাঠিয়ে আমি রামসিংকে দিয়ে আমার উত্তর পাঠিয়ে দিলাম,—এতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় বাঁচল। আমার উত্তরটা হল—কাল বেলা এগারোটায় হলদোয়ানিতে আমায় টেলিফোন করুন। সেটা নিয়ে রামসিং চলে যাবার পর আমি আবার ছিপটা

হাতে তুলে নিলাম, কারণ মাছ ধরতে ধরতে প্রচুর চিন্তার সময় পাওয়া যায়, এবং চিন্তার বিষয়ও আমার এখন প্রচুর। তা ছাড়া ডিনারের জন্যে মাছ ধরাও দরকার। হিউ স্টেবলের টেলিগ্রামটা স্পষ্টই গুরুতর বিপদ-সঙ্কেতের সামিল,—আমার সামনে এখন প্রশ্ন—তাঁকে সাহায্য করতে আমি কী করতে পারি ?

কোটা রোড ধরে মাইল-তুই অগ্রসর হয়ে আমি পৌছলাম আমাদের গোলাবাড়ির সীমানার কাছে যেখানে আমি নিতান্ত ছেলেবেলায় আমার প্রথম চিতাবাঘ শিকার করি। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে নদীর বুকে একটা জলাশয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম,—এখানে একটা দেড়সেরী মহাশের মাছ ছিল যার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। জলাশয়ের কাছে আসতে একটা বাঘের পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়ল,—বাঘটা সেদিন সকালে নদী পার হয়ে চলে গেছে। এই জলাশয়ের মাথায় যেখানে স্রোত প্রবল আর জল গভীর, তিনটে বড়-বড় পাথর সেখানে জল থেকে এক ফুট উঁচু হয়ে রয়েছে। এই পাথরগুলি জল-কাদায় সর্বদা সিক্ত, এবং তার ফলে বরফের মত পিচ্ছিল। এই পাথরগুলোর উপর দিয়ে চিতাবাঘেরা নদী পার হয়। যে বাঘটার পায়ের ছাপ এখন বালিতে দেখা যাচ্ছে একদিন সেই বাঘটাও সেইভাবে নদী পার হবার চেষ্টা করেছিল। সেদিন আমি এক মাইল পথ ওই বাঘটার পিছু নিয়ে গিয়েছিলাম অথচ সে তা বুঝতে পারে নি। তু-তুবার আমি তাকে রাইফেলের পাল্লার মধ্যে পেয়েছিলাম, কিন্তু তু-বারই গুলি করতে নিবৃত্ত হয়েছিলাম কারণ তাকে যে একেবারে মেরে ফেলতে পারব এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি নি। তারপর যখন দেখলাম সে নদীর দিকে চলেছে, আমি কেবল তাকে চোখে চোখে রাখলাম, কারণ আমি জানতাম যে পার হবার সময় তাকে ঠিকভাবে গুলি করার সুযোগ পাব। কিন্তু আমি দেখি যে সে জলে না নেমে পাথর থেকে পাথরে পা দিয়ে দিয়ে শুকনো পায়ে নদীটা পার হতে চাইছে। এতে আমার বিশেষ সুবিধে হল, কারণ নদীতে পৌছতে হলে কুড়ি ফুট নিচু একটা খাদ আছে, এখন ওকে সেখান দিয়ে নেমে যেতে হবে। তাই যখন সে নিচে নেমে যাবার জন্যে খাদের উপরটায় পৌছয় আমি দৌড়ে গিয়ে পাড়ের উপরে পৌছে শুয়ে পড়ি।

পাথর তিনটের যা দুরত্ব তাতে কোন অলিম্পিকের প্রতিযোগী হয়ত দৌড়ে আসার জায়গা অনেকটা পেলে হপ্-স্টেপ-জাম্প করে পার হতে পারে। চিতাবাঘদের আমি দেখেছি কমনীয় তিনটি লাফে এভাবে পেরিয়ে যেতে। প্রথম লাফটা ঠিকভাবে নিয়ে দ্বিতীয়টার বেলায় কিন্তু সে গোলমাল করে ফেলে, পিছল পাথরে পা পিছলে যেতে ডিগবাজি খেয়ে গভীর জলে গিয়ে পড়ে। সেই

শব্দে আমি শুনতে পাই না কী সে বলেছিল, তবে আমি আন্দাজ করতে পারি তা কী; কারণ ওভাবে পার হতে গিয়ে আমি নিজেও একবার অমনি পা পিছলে পড়েছিলাম। কাছেই খানিকটা শুকনো বালির জমি,—কোনরকমে সেখানে পৌঁছে বাঘটা গা-ঝাড়া দেয়, তারপর শুয়ে পড়ে কেবলই গড়াতে থাকে যাতে গরম বালিতে তার চমৎকার চামড়াটা শুকিয়ে যেতে পারে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আর একবার গা ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে তার গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। আমার তরফ থেকে সে কোন বাধাই পায় না, কারণ যে বস্তু প্রকৃতির আনন্দের খোরাক জোগায় তাকে আঘাত করা খেলোয়াড়ি-সুলভ কাজ নয়। এখন আবার বালিতে বাঘটার পায়ের ছাপ দেখা যেতে লাগল কিন্তু এবার পাথরগুলোয় পা দিয়ে দিয়ে পার হয়ে যেতে তার অসুবিধে হল না, কারণ বালিটা পার হবার সময় তার পা শুকিয়ে গিয়েছিল।

এই পাথরগুলোর নিচে ওদিকের তীরের কাছে একসার পাথর মাথা উঁচু করে একটা বদ্ধ জলার সৃষ্টি করেছে, আমার বন্ধু সেই দেড়সেরী মহাশের মাছটা থাকত সেখানে। বঁড়শিটা ওই চালু পাথরের উপর ফেলে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতেই মহাশেরটা বেগে বেরিয়ে এসেছিল। দু-দুবার ঘটেছিল ব্যাপারটা। ছিপটা ফেলতে হচ্ছিল অনেকটা দূর থেকে, এবং তাও খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল, কারণ, প্রথমত, গাছের একটা ডাল ওদিকে ঝুঁকে পড়েছিল, আর দ্বিতীয়ত, অনেকটা ঝুঁকে পড়ে ছিপটা ফেলতে হচ্ছিল, কারণ জলে স্থলে শূন্যে সর্বত্র শত্রু থাকায় মহাশের মাছের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাই আমাকে বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হতে হত। বালি ভরা তীর আর সেখানকার পায়ের দাগগুলো ছেড়ে আমি নদীটার গতিপথ ধরে খানিকটা অগ্রসর হলাম। যে দশ ফুট সুতোটা আমি সেদিন সকালে অনেক যত্নে তৈরি করেছিলাম একটা পাথরের নিচে সেটাকে ভিজতে দিয়ে আমি ছিপটা রেখে ধূমপান শুরু করলাম। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতে আমি হুইল থেকে দরকার-মত সুতো খুলে নিলাম। তারপর খুব সাবধানে সেটা বাঁ হাতে ধরে গুঁড়ি মেরে সেই একমাত্র জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম যেখান থেকে সুতোটা কোন-রকমে পাশভাবে ফেলা যায়— চিরাচরিত প্রথায় ফেলা সম্ভব নয় এখানে। বঁড়শিটা গিয়ে পড়ল ঠিক যেখানটায় ফেলতে চেয়েছিলাম সেখানে, আর টান পড়তে সেটা সশব্দে পাথরটার উপর থেকে গভীর জলে পড়ে গেল আর এবার নিয়ে তিনবার আমার বন্ধুটি ঠিক গাঁথা পড়ল। হালকা হাতিয়ার নিয়ে মহাশের মাছের প্রথম টান সরাসরি রোধ করা অসম্ভব; তবে টানটা ঠিক হিসেব-মত রাখতে পারলে, যে পাথরের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়তে চায় সেখান থেকে তাকে ঠেকিয়ে রাখা

অসম্ভব নয়, যদি অবশ্য শিকারী যেদিকে আছে পাথরটা সেদিকে না হয়। আমি ছিপ ফেলেছিলাম নদীর ডান তীর থেকে, আর মাছটাকে যেখানে গেঁথেছিলাম তা ত্রিশ গজ নিচে একটা বাঁকা শেকড় জলের মধ্যে বেরিয়ে এসেছিল। দু-দুবার মাছটা এই শেকড়ের সাহায্যে আমায় ফাঁকি দিয়েছিল। এবার আমি তাকে কোনমতে আটকাতে পেরেছি—মাত্র দু-এক ইঞ্চি থাকতে। জলাশয়ের মধ্য যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত, তাই আমি ইচ্ছে-মত খেলায় তাকে বাধা দিলাম না। তারপর সে ক্লান্ত হলে তাকে বালির তীরের কাছে এনে হাতে করে তুলে নিলাম, কারণ মাছ তোলার কোন জাল আমার সঙ্গে ছিল না। আমার দেড় সের হিসেবটায় এক পোয়াটাক ভুল ছিল—সেটা অবশ্য বেশির দিকেই। সুতরাং শুধু আমাদের ডিনারেই নয়, গ্রামের একটা অসুস্থ ছেলের ম্যাগি সেবা-শুশ্রূষা করছিল, তাকেও একটু ভাগ দেওয়া যাবে, কারণ যে-কোন জিনিসের চেয়ে মাছেরই সে বেশি ভক্ত।

ছেলেবেলায় বন্দুক ছোড়া শিক্ষার সময়ে যে উপদেশ পেয়েছিলাম সেই অনুসারে আমি হিউ স্টেবলকে যে টেলিগ্রাম পাঠালাম তাতে নিশ্চয় করে কিছু জানালাম না, এবং এই সুযোগে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় পেলাম। বাঘটার পায়ের দাগ দেখতে পাওয়ার ফলেই হোক বা মহাশের শিকারে সাফল্যের ফলেই হোক, বাড়ি যখন ফিরলাম ততক্ষণে আমি মনস্থির করেছি হিউ স্টেবলকে জানিয়ে দেব যে বড়লাটের ছুটি কাটাবার একমাত্র যে জায়গার কথা আমি বলতে পারি সে হল কালাঢুঙ্গি। ম্যাগি চা তৈরি করে বারান্দায় নিয়ে এল, আর এই নিয়ে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বাহাদুর এসে হাজির। আমি জানি যে দরকার হলে বাহাদুর পেটের কথা চেপে রাখতে পারে; তাই দিল্লী থেকে আসা টেলিগ্রামটার কথা তাকে বললাম। উত্তেজনা হলে বাহাদুরের চোখ একেবারে নাচতে শুরু করে, কিন্তু সেদিনের মত অমন নাচতে আর কখনো দেখি নি।—তাহলে বড়লাটের কালাঢুঙ্গি আসার সম্ভাবনা! বাব্বা! এ-হেন ব্যাপারের কথা কে কবে শুনেছে! তবে তো তার জন্যে জবর বন্দোবস্ত করতে হবে! আর সময়টাও বেশ জুতসই হয়েছে,—ধান কাটা শেষ, গ্রামের সকলেরই সাহায্য মিলবে। পরে যখন খবরটা ছড়িয়ে পড়ল যে বড়লাট আমাদের জঙ্গল অঞ্চলে আসছেন, কেবল আমাদের প্রজারাই নয়, কালাঢুঙ্গির প্রত্যেকেই বাহাদুরের মত উৎসাহিত হয়ে উঠল। এ থেকে কোন লাভ বা সুযোগ-সুবিধের চিন্তায় নয়,—এ কেবল এই শুভাগমন তাঁদের পক্ষে যতটা সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব সেই চেষ্টার উৎসাহে।

পরদিন সকালে আমি অন্ধকার থাকতে চোদ্দ মাইল হাঁটা-পথ ধরে হলদোয়ানির পথে বেরিয়ে পড়লাম, কারণ হিউ স্টেবলের সঙ্গে কথা কইবার আগে আমি জিওফ্ হপকিন্সের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম—তিনি তখন ফতেপুরে তাঁবু করে ছিলেন। এ-পথের প্রথম সাত মাইল হল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে,—আর এই ভোরে সে পথে বনের প্রাণী আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কালাঢুঙ্গির বাজার থেকে এক মাইল এগোতে অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, রাস্তার ধুলোর উপর একটা পুরুষ চিতাবাঘের টাটকা পায়ের দাগ আমার চোখে পড়ল—এ দাগ চলে গেছে যেদিকে আমি চলেছি সেই দিকেই। কিছুক্ষণ পরে একটা মোড় ফিরতেই সামনে দুশো গজ তফাতে একটা চিতাবাঘ আমার চোখে পড়ল। মনে হল সে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে, কারণ মোড়টা ভাল করে ফিরতে না ফিরতেই সে মাথা ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। যাই হোক, তবুও সে সেইভাবেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল আর থেকে-থেকে পিছন ফিরে আমায় দেখতে লাগল। দূরত্বটা যখন আমি কমিয়ে পঞ্চাশ গজে এনেছি তখন সে পথ ছেড়ে একটা হালকা ঘাস-জমিতে নেমে গেল। তেমনি একভাবে সামনে তাকিয়ে এগোতে এগোতে আমি চোখ টেরিয়ে দেখলাম, রাস্তা থেকে কয়েক ফুট তফাতে সে ঘাসের উপর গুঁড়ি মেরে রয়েছে। আরও একশো গজ মত এগোবার পর আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, আবার সে রাস্তার উপর উঠেছে আর আমায় একজন সাধারণ পথচারী মনে করে পথ ছেড়ে দিয়েছে। আর কয়েকশো গজ অগ্রসর হবার পর তাকে পথ থেকে নেমে একটা গভীর দরির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখলাম। মাইল-খানেকের মত এখন পথে আমি একা। তারপর ডানদিকের জঙ্গল থেকে পাঁচটা বনকুত্তা লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। যেমন নির্ভীক, তেমনি অত্যন্ত দ্রুতগতি তারা; প্রজাপতির মত নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে তারা বনে দৌড়ে বেড়ায়, আর খিদে পেলে খায় যা সবচেয়ে সেরা। যত প্রাণী আমার জানা আছে, ভারতীয় বনকুত্তাদের মত অত উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা তাদের কারুর নয়।

আমি যখন বন-বাংলোয় পৌঁছলাম তখন জিওফ্ আর জিলা হপকিন্স প্রাতরাশে বসেছেন,—একটু সকাল-সকালই। আমি কী কাজে হলদোয়ানি যাচ্ছি তা শুনে তাঁরা যেমন খুশি তেমনি উৎসাহিত হলেন। জিওফ্ তখন তরাই আর ভাবর গভর্মেণ্ট এস্টেটের বিশেষ বন-রক্ষক, তাই তাঁর সাহায্য ভিন্ন হিউ স্টেবলের কাছে কোন নির্দিষ্ট মতলব বাতলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জিওফ্ উৎসাহের সঙ্গেই সাড়া দিলেন। শিকারে সাফল্য পেতে হলে বনের মধ্যে দুটো শিকারের আস্তানা দরকার। যে দুটো আস্তানা আমার পছন্দ দুটোই সৌভাগ্যবশত

তখন খালি ছিল, জিওফ্ বললেন তিনি সে দুটো আমার জন্যে রেখে দেবেন। পার্শ্ববর্তী সংরক্ষিত অঞ্চল দাচাউরির যে আস্তানা তিনি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্যবহারের জন্যে দিলেন। বাঘের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করা আর মহাশের মাছ ধরা থেকে আরম্ভ করে জিওফের সঙ্গে এই সাফল্যমণ্ডিত সাক্ষাৎকার—এ সমস্তই চমৎকার আমার অনুকূলে যেতে লাগল। হলদোয়ানির পথের মাইলের পর মাইল কখন যে অতিক্রম করে গেলাম তা যেন টেরই পেলাম না। । । ।

ঠিক এগারোটার সময় হিউ স্টেবলের টেলিফোন এল। তিনশো মাইল ব্যবধান থেকে আমাদের এই কথাবার্তা অব্যাহত চলল এক ঘণ্টা ধরে। হিউ জানতে পারলেন যে হিমালয়ের পাদদেশে কালাঢুঙ্গি নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে যার চারদিকে জঙ্গল আর সেই জঙ্গলে অনেক রকম শিকারের প্রাণী আছে, এবং ছুটি কাটাবার পক্ষে তার চেয়ে ভাল কোন জায়গা আমার জানা নেই। হিউয়ের কাছে শুনলাম বড়লাটের দলে থাকবেন মহামান্য লর্ড লিনলিথ্গো ও তাঁর স্ত্রী, আর তাঁদের তিন কন্যা—লেডি অ্যান, জোন ও ডোরীন (বাণ্টি) হোপ। আর সেই দলে আসবেন বড়লাটের স্বীয় দপ্তরের কর্মচারিবৃন্দ, কারণ ছুটির মধ্যেও বড়লাটকে পুরো দিনের কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত শুনলাম নাকি শিকারের প্রস্তুতির জন্যে আমি সময় পাব পনেরো দিন। বড়লাটের গৃহস্থালির তত্ত্বাবধায়ক মাউজ ম্যাক্সওয়েল পরদিন দিল্লী থেকে মোটরে এসে পৌঁছলেন। আর তাঁর পরে এলেন পুলিশের প্রধান, সি. আই. ডি-র প্রধান, নাগরিক প্রশাসনের প্রধান, বন-বিভাগের প্রধান, আরও অনেক অনেক বিভাগীয় প্রধান। আর, সবচেয়ে যা ভয়ের কথা, একজন রক্ষী—তার কাছে শুনলাম বড়লাটের দেহরক্ষক হিসেবে একদল সৈন্যও কালাঢুঙ্গি আসছে।

বাহাদুর যে বলেছিল জবর বন্দোবস্ত করতে হবে, ঠিকই বলেছিল। কিন্তু সে বন্দোবস্ত যে কত জবর হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা তার বা আমার স্বপ্নেও কখনো ছিল না। যাই হোক, সকলের আপ্রাণ সাহচর্য ও সাহায্যের ফলে কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলল, কোন কলহ-বিবাদ হয় নি বা বাধা পড়ে নি। প্রচুর সাফল্যের সঙ্গে চারটি বীটের ব্যবস্থা হল এবং চারটি বাঘ দিব্যি শিকার করা হল,—শিকার করলেন যাঁরা আগে তাঁরা কখনো জঙ্গলে বাঘ দেখেন নি,—আর গোলা গুলির খরচও হল যতটা কম সম্ভব। বীট করে বাঘকে বার করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে একমাত্র তারাই ঠিকমত বুঝতে পারবে এ সাফল্যের তাৎপর্য। এই স্মরণীয় শিকার অভিযানের শেষ দিন হল আজ,—দলের যে কনিষ্ঠতম কেবল তারই

এখন বাঘ শিকার বাকি। সেদিনের বীটটার ব্যবস্থা হল একটা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি এলাকা ঘিরে, প্রাচীন যুগে যেটা ছিল বুয়র নদীর গর্ভ কিন্তু এখন ছোট-বড় গাছ-গাছড়ার ঝোপে জঙ্গলে আর নল-ঘাসে আর বুনো কমলালেবুর ঝোপে নিবিড়। এক কালে যেটা ছিল নদীর তীর সেখানে বড় বড় পাঁচটা গাছে পাঁচটা মাচান বাঁধা হয়েছে—নিচের জমি থেকে বাঘটাকে তাড়িয়ে এদিকে আনা হবে।

অনেকটা ঘুরিয়ে আমি সবাইকে মাচানে পেছন দিয়ে নিয়ে গেলাম, কারণ অনেক বীট পণ্ড হয়ে যেতে দেখেছি বাঘ যেখানে থাকার সম্ভাবনা তার সামনে দিয়ে বন্দুক হাতে চলে যাবার ফলে। যারা বাঘের গতি রোধ করবে তারাও সঙ্গে ছিল, সে-সব গাছ আমি তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম আমার ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেইসব গাছে গিয়ে উঠল, আর পিটার (বড়লাটের এক এ. ডি. সি.), বাহাদুর আর আমি বন্দুকধারীদের যথাস্থানে বসিয়ে দিলাম। এক নম্বর মাচানে বসালাম অ্যানকে, আর দু-নম্বরে বড়লাটকে। তিন নম্বরটা হল বড় গাছের অভাবে একটা ছোটখাটো কুল-জাতীয় গাছ, আমার মতলব ছিল বাহাদুরকে সেই গাছে বসিয়ে বাঘটাকে তাড়া দেওয়া। তাড়া খেয়ে বাঘটা বাঁ দিকে মোড় ফিরবে, এই কারণে বার্টিকে বসালাম চার নম্বর মাচানে, দলের মধ্যে একমাত্র সে-ই এ পর্যন্ত কোন বাঘ মারে নি।

যে ঝোপটার মধ্যে বাঘটা ছিল সেদিক থেকে বেরিয়ে একটা পশু-চলার পথ নদীর তীর ধরে এসে সোজা তিন নম্বর মাচানের তলা দিয়ে চলে গেছে। আমি নিশ্চয় জানতাম যে বাঘটা এই পথ ধরে আসবে, এবং মাচানটা মাটি থেকে ছ-ফুট উঁচু হওয়ায় আমি ভেবে দেখলাম যে যদিও কোন অভিজ্ঞ মানুষকে তাড়া দেবার জন্যে এখানে বসানো যেতে পারে, কোন বন্দুকধারীকে এখানে বসানো অত্যন্ত বিপদজনক হবে। মেয়েদুটি, পিটার, বাহাদুর আর আমি মাচানের কাছে গিয়েছি, বাহাদুর মাচানে উঠতে যাচ্ছে, ঠিক এ-হেন মুহূর্তে আমি আমার মতলব পালটালাম। মাচানটা ছিল ঠিক আমার মাথা-বরাবর। সেখানে হাত দিয়ে আমি ফিস-ফিস করে বার্টিকে বললাম যে আমি চাই সে সেখানে বসুক,—তার সঙ্গী হবে পিটার। বিপদের সম্ভাবনাটা তাকে বুঝিয়ে দেবার পরও সে কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই সেখানে বসতে রাজি হল। তখন আমি তাকে অনুরোধ করলাম যেন আমার চিহ্নিত একটা জায়গা পর্যন্ত বাঘটা না এলে কোনমতেই গুলি না করে, আর গুলি যেন করে খুব ভাল করে তার গলা লক্ষ্য করে। বার্টি আমায় কথা দিল তাই করবে। তখন পিটার আর আমি তাকে ধরে মাচানে তুলে দিলাম। তারপর পিটারকেও ওঠবার ব্যাপারে সাহায্য করবার পর আমি তাঁকে

আমার ৪৫০।৪০০ ডি. বি. রাইফেলটা দিলাম,—এই রাইফেলটা হল বাণ্টির রাইফেলের অনুরূপ। (পিটারের কোন অস্ত্র ছিল না, কারণ কথা ছিল তিনি আমার সঙ্গে বীটে থাকবেন।) তারপর আমরা এগিয়ে গেলাম পশু-চলা পথ ধরে। মাচান থেকে কুড়ি গজ মত দূরে এসে আমি একটা শুকনো কাঠি রাস্তার উপর আড়াআড়ি করে রাখলাম আর সেইসঙ্গে মুখ তুলে বাণ্টির দিকে তাকালাম। সেও মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে বুঝেছে।

লেডি জোন, বাহাদুর আর আমি তখন গেলাম যে গাছে চার নম্বর মাচান তৈরি হয়েছে সেখানে। মাটি থেকে মাচানটার উচ্চতা কুড়ি ফুট, এবং কোনও আড়াল না থাকায় ত্রিশ গজ দূরের তিন নম্বর মাচানটা এখান থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। রাইফেলটা তাঁকে দেবার জন্যে জোনের পিছু-পিছু আমি মই বেয়ে উঠে ওঁকে অনুরোধ করলাম লক্ষ্য রাখতে, যদি বাণ্টি আর পিটার বাঘটাকে থামাতে না পারে, কোনমতেই যেন তিনি বাঘটাকে তিন নম্বর মাচান পর্যন্ত পৌঁছতে না দেন। তিনি আমায় নিশ্চিন্ত হতে বললেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। নদীতীরের এদিকটায় ঝোপ-টোপ নেই, কেবল ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু গাছ আছে। কাজেই এই বাঘটা যখন ষাট গজ দূরের ঝোপ থেকে বেরোবে তখন দুটো মাচান থেকেই তাকে দেখা যাবে স্পষ্ট, যতক্ষণ না সে, আমি যেমন আশা করছি, বাণ্টির গুলিতে মারা পড়ছে। বাহাদুরকে পাঁচ নম্বর মাচানে রেখে দিলাম যাতে দরকার হলে তাড়া দিতে পারে, তারপর আমি বীটের বাইরে দিয়ে ঘুরে বুয়র নদীতে এসে পৌঁছলাম।

যে ষোলটা হাতি দিয়ে বীট করানো হবে, যেখানে আমি মহাশেরটা ধরেছিলাম তার কাছে—অর্থাৎ ওখান থেকে সিকি মাইলটাক দূরে তাদের একত্র করা হল। আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু বুড়ো মোহনের নেতৃত্বে তারা চলবে। মোহন ছিল ত্রিশ বছর উইণ্ডহ্যামের প্রধান শিকারী,—বাঘ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ভারতের যে-কোন লোকের চেয়ে বেশি। মোহন আমার খোঁজ করছিল, তাই জঙ্গলের ভিতর থেকে আমায় আসতে আর টুপি দোলাতে দেখে সে নদী ধরে হাতিগুলোকে রওনা করে দিল। নুড়ি-বিছানো পথে ষোলটা হাতির একটার পেছনে একটা করে সিকি মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগবে খানিকটা। তাই একটা পাথরের উপর বসে ধূমপান করতে করতে চিন্তার অবসর হল। যতই চিন্তা করলাম ততই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। জীবনে এই প্রথম আমি একজনের—কিংবা হয়ত দু-জনের জীবন বিপন্ন করে তুললাম, এবং এটা যে প্রথম বার, এ কথাতেও মনে কোন সান্ত্বনা মিলল না। কালাঢুঙ্গিতে এসে পৌঁছবার আগে লর্ড

লিনলিথ্‌গো আমায় বলেছিলেন সকলের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিতে। এই কর্তব্য সবাই খুব নিখুঁতভাবে পালন করে আসছিল; তিনশোর বেশি লোক তাঁবু করে রয়েছে, প্রতিদিন শিকার করছে মাছ ধরছে, কারুর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। কিন্তু আজ এই শেষের দিনে সবার বিশ্বাসভাজন আমি নিজেই বুঝি এমন একটা কাজ করে ফেললাম যে হয়ত আমার তার জন্যে অনুতাপ করতে হচ্ছে। মাটি থেকে মাত্র ছ-ফুট উঁচু একটা পলকা মাচান, সেখানে বাগয়েছি বছর-ষোল বয়সের এক বালিকাকে তেড়ে-আসা বাঘকে গুলি করবার জন্যে, গুলি করবার পক্ষে যা হল সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি। বার্বি আর পিটার দু-জনেই অবশ্য বাঘের মতই দুঃসাহসী, কারণ বিপদের সম্ভাবনাটা ভাল করে জেনে নিয়েও তারা বিনা দ্বিধায় মাচানে উঠেছে। কিন্তু বন্দুকে লক্ষ্য নিখুঁত না হলে কেবলমাত্র সাহসই যথেষ্ট নয়, এবং তারা এমনকি বন্দুক সিধে করে ধরতে পারে কি না তাও আমার জানা নেই সঠিক। মোহন যখন তার হাসিমুখ নিয়ে এসে পৌঁছল তখনও আমি বীট চালাব না বন্ধ করে দেব সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারি নি। সমস্ত ব্যাপারটা তাকে খুলে বলতে মোহন প্রথমে হাওয়া টেনে শিস দিয়ে উঠল, তারপর শক্ত করে চোখ বন্ধ করল, তারপর আবার বন্ধ চোখ খুলল। তারপর বললে, 'ঘাবড়াবেন না সাহেব, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সমস্ত মাহুতদের একত্র করে আমি তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে বাঘটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু ভয় পাওয়ালে চলবে না। হাতিগুলোকে নদীর তীরে লাইন করে সাজাবার পর ওরা আমার নির্দেশ গ্রহণ করবে। যখন দেখবে আমি মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে দোলাচ্ছি তারা একবার চিৎকার করে উঠবে, তারপর হাততালি দিতে শুরু করবে এবং হাততালি দিয়ে চলবে যতক্ষণ না আমি হ্যাটটা আবার মাথায় পরাচ্ছি। এই ব্যাপার চলবে কিছুক্ষণ পরে পরে। এতেও যদি বাঘটা না নড়ে তখন আমি ওদের অগ্রসর হবার সঙ্কেত করব এবং সে অগ্রগমন হবে নিঃশব্দে ও অত্যন্ত মন্থর গতিতে। প্রাথমিক চিৎকারটার ফলে দুটো কাজ হবে : এক, এতে করে বাঘের ঘুম ভাঙবে, আর দুই, বন্দুকধারীরা সতর্ক হবে।

যে জঙ্গলটা বীট করতে হবে সেটার আয়তন চওড়ায় তিনশো গজ আর লম্বায় পাঁচশো গজ। হাতিগুলো আমার দু-দিকে লাইন করে দাঁড়ালে আমি হ্যাটটা খুলে নিয়ে দোলাতে লাগলাম। তখন ওরা খুব জোরে একটা চিৎকার করে হাততালি দিতে শুরু করল। তিন-চার মিনিট হাততালি দেওয়া হয়ে গেলে আমি টুপিটা আবার মাথায় পরলাম। এই অঞ্চলটায় ছিল সম্বর, চিতল, কুরু হরিণ, ময়ূর আর বন-মোরগ, তাই কোন সঙ্কেত-সূচক শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

কিন্তু কিছুই আমার কানে এল না। পাঁচ মিনিট পরে আমি আবার টুপিটা খুলে নিয়ে দোলাতে লাগলাম। এক মিনিট কি দু-মিনিট পরেই একটা রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। আমি মুহূর্তগুলো গুনতে লাগলাম, কারণ বাঘের বীটের সময়ে পর-পর গুলির আওয়াজের মধ্যবর্তী বিরতির সময় হিসেব করলে অনেক কিছুই জানতে পারা যায়।—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—আমি গুনতে লাগলাম। তারপর আমি নিশ্বাস গ্রহণ করলাম। এমন সময় অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্দুকের দুটো আওয়াজ আমার কানে এল। তারপর আবার : এক—দুই—তিন—চার : চতুর্থ একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। প্রথম আর চতুর্থ এই দুটো গুলি নিক্ষিপ্ত হয় বন্দুকের মুখ আমাদের দিকে ফিরিয়ে, আর বাকি দুটো হয় অন্য দিকে ফিরিয়ে। এর মাত্র একটাই অর্থ হতে পারে : সেটা হল, নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে, এবং জোনকে সাহায্যে আসতে হয়েছে, কারণ বড়লাট যে-মাচানে ছিলেন সেখান থেকে বাল্টির মাচান দৃশ্যমান নয়।

আমার হৃদস্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠল, যে আতঙ্কে আমার মন ভরে উঠল কথায় তার প্রকাশ হয় না। হাতিদের চালাবার ভার মোহনের উপর দিয়ে আমি আমার হাতির মাহুত আজমতকে বললাম যত বেগে সম্ভব গুলির আওয়াজ অনুসরণ করে যেতে। আজমতের শিক্ষা হয়েছিল উইণ্ডহ্যামের কাছে—সম্পূর্ণ অকুতোভয় সে, তার মত মাহুত আমি আর একটি দেখি নি। আর তার হাতিও শিক্ষায় সহবতে তারই উপযুক্ত। কাঁটা-ঝোপ ভেঙে, বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে ভাঙা পথ মাড়িয়ে, মাথার উপরের ঝুলে-পড়া ডালপালার তলা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম—আমার দুশ্চিন্তা আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তারপর একফালি বারো ফুট লম্বা নল-ঘাসের বনের মধ্যে প্রবেশ করার পর হাতিটা ইতস্তত করতে লাগল। তা দেখে আজমত পেছন ফিরে ফিস-ফিস করে আমায় বললে, 'ও বাঘের গন্ধ পেয়েছে সাহেব ; সাবধানে থাকুন, কারণ আপনি নিরস্ত্র।'

আর মাত্র একশো গজ পথ বাকি, অথচ এখনো বন্দুকধারীর কাছ থেকে কোন সঙ্কেত এল না যদিও প্রত্যেককেই একটা করে রেলের হুইস্‌ল্ দেওয়া আছে দরকার হলে বাজাবার জন্যে। হুইস্‌ল্ শোনা যায় নি এ কথা ভেবেও আমার মনে কোন স্বস্তি এল না, কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে উত্তেজনার মুহূর্তে হুইস্‌লের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুও মাচান থেকে পড়ে যায়। তারপর গাছের ফাঁক দিয়ে আমি জোনকে দেখতে পেলাম। স্বস্তিতে, আনন্দে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, কারণ দেখলাম রাইফেলটা দুই উরুর উপর রেখে সে নির্বিকার মাচানে বসে আছে। আমায় দেখতে পেয়ে সে দু-হাত

প্রসারিত করে দেখালো, যার অর্থ—বাঘটা বেশ বড়, তারপর বাণ্টির মাচানের সামনে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল।

এর পরের ঘটনা, যা বর্ণনা করতে আজ পনেরো বছর পরে পর্যন্ত আমার হৃদয়ের একটা স্পন্দন হারিয়ে যায়, সেটা খুব সংক্ষিপ্ত। তা হল, তিনটি তরুণ তরুণীর দুঃসাহস, আর লক্ষ্যভেদের চরম ক্ষমতা। এ না হলে ফলাফল অত্যন্ত বিয়োগান্ত হতে পারত।

বীট শুরুর সময় যে চিৎকার উঠেছিল তা বন্দুকধারীরা শুনতে পেয়েছিল স্পষ্ট, হাততালির ক্ষীণ আওয়াজটাও। তারপর বিরতির সময়টায় বাঘটা বেরিয়ে যেখানে আসে সে জায়গাটা হল তিন নম্বর মাচান থেকে ষাট গজেরও বেশি দূরে। তারপর বাঘটা পশু-চলা পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। হাতি থেকে আমাদের দ্বিতীয় বারের চিৎকার যখন শুরু হল বাঘটা তখন নদীর পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। চিৎকারটা কানে যেতে সে থেমে পড়ে মাথা ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল, তারপর যখন নিশ্চিন্ত হল যে কোন তাড়া নেই, দু-এক মিনিট কান পেতে শুনে সে নদীর তীর ধরে উঠতে শুরু করল। রাস্তার উপরে যেখানে আমি শুকনো কাঠিটা রেখেছিলাম বাঘটা সেখানে পৌঁছতে বাণ্টি গুলি করল। গুলি করল কিন্তু তার বুকে, মাথা নিচু করে অগ্রসর হওয়ার ফলে গলাটা লক্ষ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। গুলিটা লেগেছিল ঠিকই; সেটা খেয়ে বাঘটা, বাণ্টি বা পিটারের মাচান থেকে দ্বিতীয় কোন গুলি খাওয়ার আগে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ল, তারপর গর্জন করতে করতে মাচানটার তলায় এসে সেখান থেকে সেটাকে আক্রমণ করল। বেঁটে গাছটার উপরে পলকা মাচানটা যখন দুলছে আর বাঘটার আক্রমণে যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে আর বাণ্টি আর পিটার উন্মত্তের মত মাচানের ফাঁক দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে দেবার চেষ্টা করে চলেছে, ত্রিশ গজ দূরের মাচান থেকে জোন তখন একটা গুলিতে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললেন, তারপর দ্বিতীয় গুলিটাও ছুড়লেন। এই দ্বিতীয় গুলিটা খেয়ে বাঘটা নদীর তীর ধরে নেমে যাচ্ছিল—যে ঘন ঝোপ থেকে এসেছিল সেখানে যাবার উদ্দেশ্যেই মনে হয়, এমন সময় বাণ্টি তার মাথার পেছনে আর একটা গুলি করে।

এই হল আমাদের বড়লাটের প্রথম কালাঢুঙ্গি সফর, কিন্তু শেষ সফর এ নয় কোনমতেই। এরপরে আরও অনেকবার তাঁর আগমনে আমাদের ছোট্ট তরাইয়ের গ্রাম সম্মানিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর বা তাঁর দলের কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে আর কখনো মুহূর্তের জন্যেও আমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে নি, কারণ সেই স্মরণীয় সফরের শেষ দিনের মত ঝুঁকি ভুলেও আর কখনো আমি গ্রহণ করি নি।

নভেম্বর থেকে মার্চ—হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এই সময়ের জল-বায়ুর কোনও তুলনা নেই। আর এর মধ্যে আবার সবচেয়ে ভাল সময় হল ফেব্রুয়ারি। বাতাসে তখন নবজীবনের স্পন্দন, আর যে অসংখ্য প্রাণী উঁচু পাহাড়-অঞ্চল থেকে খাদ্য ও উষ্ণ আশ্রয়ের সন্ধানে নেমে আসে তখনও চলে যায় না তারা। যে-সব পত্রমোচী গাছ সমস্ত শীতকালটা পত্রহীন ছিল এই সময় তাদের কোনটায় ফুল ফুটতে শুরু করে, কোনটা বা ছেয়ে যায় কচি-কচি পাতায়। সবুজ আর গোলাপি রঙের কত রকমফেরই না তাদের মধ্যে! বসন্তের ছোঁয়া তখন বাতাস ছেয়ে; প্রতিটি গাছের রসে, প্রতিটি প্রাণীর রক্তে পরিব্যাপ্ত। উত্তরের পাহাড়-অঞ্চলে হোক, দক্ষিণের সমতল অঞ্চলে হোক বা তরাই অঞ্চলেই হোক, বসন্তের আবির্ভাব কিন্তু হয় রাতারাতি। এক শীতের রাত্রে হয়ত আপনি শুতে গেছেন, পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন, দেখলেন যে বসন্তকাল শুরু হয়ে গেছে। সারা প্রকৃতি আপনাকে ঘিরে বসন্তের আসন্ন আনন্দের কল্পনায় উদ্বেল—প্রচুর খাদ্যসামগ্রী, গরমের আরাম, প্রাণের পুনঃপ্রকাশ। যাযাবর পাখিরা ছোট-ছোট ঝাঁকে ঘুরছে ফিরছে,—অন্যান্য দলের সঙ্গে তারা একত্র হবে কোনও নির্দিষ্ট দিনে, পায়রা বা তোতাপাখি বা দোয়েল বা আর-আর ফলাহারী পাখিরা আপন-আপন সর্দারের নির্দেশে উপত্যকা থেকে উঠে এসে যে যার নির্দিষ্ট বাসায় চলে যাবে, আর যারা পতঙ্গভুক তারা গাছ থেকে গাছে বেগে যেতে যেতে সেই একই উদ্দেশ্যে একই অভিমুখে অগ্রসর হয়ে দিনে মাত্র কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করবে। যাযাবর পাখিরা বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি আছে, আর যে-সব পাখি এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা তারা যে যার সঙ্গীর সন্ধান করে খোঁজ করে কোথায় বাসা বাঁধবে। এদিকে বনের সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে যেন ডাকের প্রতিযোগিতা শুরু হল,—সে ডাক শুরু হয় দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় সর্বভুক পাখিরা পর্যন্ত, আর তাদের মধ্যে গলার জোর যার সবার বেশি, সেই তিলিয়া বাজ অনেক উঁচুতে উঠে এতটুকু হয়ে গিয়েও তার তীক্ষ্ণ স্বর পাঠিয়ে দেয় মাটির পৃথিবীতে।

জঙ্গলের লড়াইয়ে শিক্ষাদানের সময় একদিন আমি মধ্যভারতের এক জঙ্গলে

গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল একদল পক্ষি-বিশারদ। মাথার উপরে, অনেক—অনেক উঁচুতে একটা তিলিয়া বাজ ঘুরছিল আর চিৎকার করে চলছিল। আমার সঙ্গের দলটা এসেছে ব্রিটেন থেকে, যাবে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউই ইতিপূর্বে তিলিয়া বাজ দেখেনি। একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে আমি আকাশে একটা ছোট্ট দাগ মত ওদের দেখালাম। দূরবীন বার করা হল, কিন্তু হতাশ হল সবাই, কারণ পাখিটা এত উঁচুতে, যে তাকে সনাক্ত করা বা স্পষ্ট করে দেখা সম্ভব হল না। সঙ্গীদের চুপ করে থাকতে বলে আমি পকেট থেকে একটা তিন ইঞ্চি ভেঁপু বার করলাম, তারপর খুব জোরে ফুঁ দিলাম তাতে। ভেঁপুটার একটা দিক খোলা আর একটা দিক বন্ধ,—অত্যন্ত নিপুণভাবে তাতে বিপন্ন হরিণ-শিশুর তীক্ষ্ম চিৎকারের নকল করা যেত। সঙ্কেতের শিক্ষা গ্রহণের সময়ে এটার ব্যবহার হত, কারণ দিনে বা রাত্রে এটাই হল বনের একমাত্র স্বাভাবিক আওয়াজ; সুতরাং কোন শত্রুকে আকর্ষণ করবার মত নয়। শুনেই তিলিয়া বাজটা চিৎকার বন্ধ করল, কারণ সাপ প্রধান খাদ্য হলেও অন্য খাদ্যে তার অরুচি ছিল না। ডানা বন্ধ করে সে কয়েকশো ফুট নেমে এল, তারপর আবার পাক খেতে খেতে উপরে উঠতে শুরু করল। তারপর প্রতিটি ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই নেমে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বড় বড় গাছগুলো বরাবর এসে ঘুরতে লাগল। এখন আর তাকে স্পষ্ট দেখতে আমাদের অসুবিধে হল না। পঞ্চাশ জনের সেই দলের যাঁরা ব্রহ্মের যুদ্ধের পর জীবিত আছেন তাঁদের কি চিন্দোয়ারার সেই দিনের কথা মনে আছে যখন কিছুতেই আমি বাজটাকে ফোটো তোলার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী কোন ডালে বসাতে পারি নি? মন খারাপ করবেন না। এই বসন্তের সকালে আসুন আমার সঙ্গে তিলিয়া বাজের মত অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রাণীরই দেখা পাবেন।

চিন্দোয়ারার সেই দিনের পরে আপনি জ্ঞানের পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। আত্মরক্ষার তাগিদে আপনি শিখেছেন যে মানুষের দৃষ্টির পরিধি ১৮০ ডিগ্রি। শব্দের উৎপত্তি সঠিক নির্ণয় করা, যা তখন আপনার কাছে এত কঠিন মনে হত, এখন তা আপনার স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় গোলাপ আর ভায়োলেট ফুলের গন্ধের পার্থক্য বুঝতে পারতেন, কিন্তু এখন যে-কোন ফুলের গন্ধ থেকে গাছটাকে চিনতে পারবেন,—যত উঁচু গাছেই হোক সে ফুল, আর জঙ্গলের মধ্যে যতই লুকোনো থাকুক। কিন্তু যতই আপনি শিখুন এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির ফলে যতই আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাক, তবু এখনো অনেক কিছু আপনার শেখার আছে এবং এই অপূর্ব বসন্ত-প্রভাতে আসুন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি লাভ করুক।

যেখানে আমাদের মেয়েরা স্নান করত, আর যেটা আমাদের এলাকার উত্তর সীমানা নির্ধারণ করছে, জলপথ থেকে পয়োনালা কেটে তাতে জল আনার ব্যবস্থা হয়েছে—এই পয়োনালীর কথা আগেই বলেছি। এর নাম হল 'বিজলী দাঁত' অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পয়োনালী। প্রথম যে পয়োনালাটা স্যর হেনরি র‍্যামজে তৈরি করিয়েছিলেন বহু বছর আগেই সেটা বাজ পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। লৌকিক কুসংস্কারে বলে যে কোন অপদেবতার হস্তক্ষেপের ফলেই কোন বিশেষ জায়গায় বজ্রপাত সাপের আকৃতিতে হয়ে থাকে। তাই সেই পুরোনো জায়গাটা ভেঙে দিয়ে অন্য একটা জায়গায় সেইরকম আর একটা পয়োনালী তৈরি হয় এবং আজ পঞ্চাশ বছর ধরে তা দিয়ে জল বয়ে আসছে। উত্তরের জঙ্গল থেকে যে-সব বন্য জন্তু রাত্রে গ্রামে আসে এবং যারা ঐ দশ ফুট চওড়া খাল সাঁতরাতে বা লাফিয়ে পার হতে চায় না তারা এই পয়োনালী ব্যবহার করে। তাই এই বসন্ত-প্রভাতে আমরা এই জায়গাটা থেকে যাত্রা শুরু করব।

পয়োনালীর খিলানের নিচের বালি-ছাওয়া পথে খরগোস, রুরু হরিণ, শুয়োর, শজারু, হায়েনা আর শেয়ালের চলা-ফেরার চিহ্ন রয়েছে। এ-সবের মধ্যে কেবলমাত্র শজারুর চিহ্নগুলোই আমরা ভাল করে লক্ষ্য করব, কারণ রাতের বাতাস নেমে যাওয়ার পর আর তার চলা-পথে উড়ো বালি এসে জমে না। পাঁচটা আঙুল আর পায়ের পাতার ছাপ দেখা যায়,—প্রতিটি পদক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ শজারুর গুঁড়ি মেরে চলবার দরকার হয় না এবং তার একটা পা আরেকটা পায়ের দাগের উপর পড়ে না। প্রত্যেকটা পায়ের দাগের সামনে বালির উপর একটা গর্ত-মত দেখা যায় (সেটা হয় তার শক্ত নখের জন্যে), খাদ্য আহরণের জন্যে তার এটার দরকার। খরগোসের পেছনের পায়ের পাতাগুলো হয় লম্বাটে ধরনের, এই লম্বাটে জিনিসটার বা গোড়ালিটার ছাপ অবশ্য ভাল্লুকের মত অতটা স্পষ্ট হয় না, তাহলেও অন্য যে-কোন প্রাণীর পায়ের দাগের থেকে একে আলাদা করে চিনে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। আরও নিশ্চিত হতে হলে খুব ভাল করে তাকালে দেখা যাবে, এই চিহ্নের মাঝ দিয়ে বা এর সমান্তরাল হয়ে কতকগুলো সূক্ষ্ম রেখা চলে গেছে। এগুলো হল শজারুর কাঁটা, তার শরীর থেকে ঝুলে থাকা,—মাটিতে ঘসটে ঘসটে গিয়ে এই রেখার সৃষ্টি করেছে। শজারুর কাঁটা মসৃণ নয়, তাতে আবার ছোট-ছোট কাঁটার মত থাকে। শজারু তার কাঁটা ছুড়তে বা ফোলাতে পারে না, আত্মরক্ষার বা আক্রমণের তার একমাত্র পদ্ধতি হল কাঁটাগুলো খাড়া করে পেছন দিকে ছুটে যাওয়া। তার ল্যাজের শেষে থাকে কতকগুলো কাটা, দেখতে সরু-বোঁটাওলা লম্বা মদের গেলাসের মত কতকটা। এই কাঁটাগুলো সে কাজে

লাগায় শব্দ করে শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্যে আব তাব ডেরায় জল বহন করবার জন্যে। ডুবলে এগুলো সহজেই জলে ভরে ওঠে, আর এই জল সে ব্যবহার করে তার ডেরা ঠাণ্ডা বা পরিষ্কার রাখবার জন্যে। শজারুরা নিরামিষাশী, ফলমূল আর শস্য হল তাদের খাদ্য। হরিণের খসে-পড়া শিং বা চিতাবাঘের বা বনকুত্তার বা বাঘের কবলে মরা হরিণের শিংও তাদের খাদ্য, তাদের স্বাভাবিক খাদ্যে ক্যালসিয়াম বা অন্য কোন খাদ্যপ্রাণের যে অভাব তা পূরণ করবার জন্যেই হয়ত। অপেক্ষাকৃত ছোট্ট প্রাণী হলেও শজারুর মনে সাহসের অভাব নেই,—অনেক বড় বড় শত্রুরও সে মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

পয়োনালার কয়েক শো গজ উপর পর্যন্ত জল-পথটির গর্ভ পাথরে পাথরে ছাওয়া ; আর কোথাও কোথাও প্রাণীর চলার চিহ্ন বাদ দিলে কোন পথ আমাদের চোখে পড়বে না যতক্ষণ না আমরা সূক্ষ্ম বালিতে ছাওয়া একটা বিস্তার্ণ এলাকায় গিয়ে পৌঁছচ্ছি—এই বালি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জলে ধুয়ে এসেছে। যত প্রাণী এখানে জল-পথ ধরে আসে তাদের সকলেরই চিহ্ন এখানে স্পষ্ট। এই বিস্তীর্ণ এলাকার দু-দিকে ঘন ল্যাণ্টানার ঝোপ,—এর মধ্যে হরিণ, শুয়োর, ময়ূর আর বন-মোরগ দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে আর কেবলমাত্র চিতাবাঘ, বাঘ আর শজারু রাত্রে প্রবেশের সাহস রাখে। সেই ল্যাণ্টানার ঝোপে এখন বন-মোরগের শুকনো পাতায় পা আঁচড়ানোর শব্দ পাওয়া যাবে। এখান থেকে একশো গজ দূরে একটা নেড়া শিমুল গাছের মগডালে রয়েছে ওদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু শা-বাজ। কেবল বন-মোরগের নয়, ময়ূরেরও মারাত্মক শত্রু সে। এরাই হল তার স্বাভাবিক শিকার। এবং যখন দেখা যাচ্ছে যে এ জঙ্গলে বয়স্ক পাখি যত অল্পবয়স্ক পাখিও ততই, তখন বুঝতে হবে যে তারা আত্মরক্ষায় সমর্থ। এই কারণে আমি শা-বাজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না, কেবল একবার করেছিলাম। একটা বিপন্ন হরিণশিশুর ডাক শুনে আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি, একটা শা-বাজ একটা একমাস-বয়স্ক চিতল হরিণকে ধরে তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, আর চিতল-শিশুর মা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে পাখিটাকে ঘিরে ঘুরছে আর সামনের পা দিয়ে তাকে মারবার চেষ্টা করছে। বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্যে বার মায়ের এ প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও (যার প্রমাণ তার মুখে আঁচড়ের আর রক্তের দাগ) শা-বাজটার মত অত বড় একটি প্রাণীর তুলনায় কিছুই নয় সে। তার শত্রুর আমি ব্যবস্থা করলাম বটে, কিন্তু তার বাচ্চাটাকে কেবল সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ, যদি-বা তার ঘাগুলো সারাতে পারতাম, তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত না। এ-হেন

ঘটনায় বহু শা-বাজ আমার গুলিতে মারা পড়েছে, শট-গানে গুলি করার মত অতটা নিকটে না পেলেও, নির্ভুল রাইফেলের পক্ষে সহজেই তাদের গুলি করা সম্ভব। শিমুল গাছের এই পাখিটার অবশ্য আমাদের থেকে কোন ভয় নেই, কারণ আমরা এখন এসেছি দেখতে; হরিণ-শিশুর শত্রুদের শাস্তি দিতে নয়। যখন আমি গুলতি দিয়ে শিকার করতাম, শা-বাজের সবচেয়ে সাঙ্ঘাতক লড়াই তখন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। লড়াইটা ঘটেছিল বুয়র ব্রিজের একটু নিচে, নদীর গর্ভে একফালি বালির মধ্যে। খরগোস-ভ্রমে একটা মেছো বেড়ালকে লক্ষ্য করে ঈগলটা নেমে এসেছিল। ঈগলটা ডানা ছাড়িয়ে নিতে পারে নি বলেই হোক কিংবা মেজাজ বিগড়ে যাবার ফলেই হোক, দুটির মধ্যে এক জীবন-মরণ লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধের সাজে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীই সমান : বেড়ালটার অস্ত্র হল দাঁত আর থাবা, আর শা-বাজটার ঠোঁট আর নখ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তখনকার দিনে ফোটোগ্রাফি ছিল কেবলমাত্র স্টুডিয়োর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এই দীর্ঘকালব্যাপী মরণ-পণ লড়াইয়ের কোন বৃত্তান্ত ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। বেড়ালের শোনা যায় নটা প্রাণ আছে, তা যদি হয় ঈগলের তাহলে আছে দশটা প্রাণ। আর এ-হেন লড়াইয়ের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত প্রাণের সংখ্যা দিয়েই হয়ে থাকে। একটা মাত্র প্রাণ কোনরকমে বজায় রেখে ঈগলটা তার মৃত শত্রুকে বালিতে রেখে একটা ভাঙা ডানা টানতে টানতে নদীর একটা জলাশয়ে নেমে গেল। তারপর তৃষ্ণা নিবারণ করে তার দশ নম্বর প্রাণটাও ত্যাগ করল।

ল্যান্টানার ঝোপ থেকে অনেকগুলো পশু-চলা পথ ফাঁকা জায়গাটার দিকে চলে গেছে। আমরা যখন ঈগলটার দিকে তাকিয়ে আছি, একটা বাচ্চা রুরু হরিণ তখন ল্যান্টানার ঝোপটা থেকে হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চাশ গজ দূরের জল-পথের কাছে গেল,—পার হবে বলেই বোধহয়। আমরা যদি একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকি তাহলে আমাদের লক্ষ্য করবে না। বনের সমস্ত জন্তুর মধ্যে রুরুই সবচেয়ে বেশি সতর্ক, এখানে এই ফাঁকাতেও সে পায়ের আঙুলে ভর করে চলেছে। তার পেছনের পা-দুটো শরীরের অনেকটা ভিতর দিকে। চোখে দেখে, শব্দ শুনে বা গন্ধ পেয়ে যেভাবেই হোক বিপদের সঙ্কেত-মাত্র সে মহা বেগে ছুটে পালায়। কখনো কখনো তাকে নীচ ও ভীরু প্রকৃতির বলে বর্ণনা করা হয়েছে; বলা হয়েছে সে জঙ্গলের প্রহরী হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়। এ বর্ণনার সঙ্গে আমি একমত নই। কোন প্রাণীকেই নীচ প্রকৃতির বলা চলে না,—নীচতা হল কেবলমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এবং রুরুর মত যে-সব প্রাণী জঙ্গলের গহনে বাঘের সঙ্গে বাস করে তাদের ভীরু অপবাদ দেওয়া যায় না। আর, নির্ভরযোগ্যতার কথায়

বলি, যে মানুষ মাটিতে থেকে শিকার করে, রুরুর চেয়ে বড় বন্ধু তার আর কেউ হতে পারে না। ছোট-খাট প্রাণী সে, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার অল্প; তার উপর শত্রু তার অসংখ্য। সুতরাং বীটের সময় যদি সে কেবলমাত্র বাঘ দেখে ডেকে না উঠে কোন ময়াল সাপ দেখেও ডেকে ওঠে তাহলে তাকে অনির্ভরযোগ্যতার অপবাদ না দিয়ে বরং করুণা করাই উচিত, কারণ তার বা তার মত অন্যান্য প্রাণীর কাছে এই দুই নির্মম শত্রুই অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং তাদের সাড়া পেয়ে ডেকে উঠে প্রহরী হিসেবে সে তার কর্তব্যই করছে—জঙ্গলকে সাবধান করে দিচ্ছে তাদের উপস্থিতির খবর দিয়ে।

রুরু হরিণের উপরের চোয়ালে দুটো লম্বা কুকুরে দাঁত থাকে। এ দুটো অত্যন্ত ধারালো,—তার আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র; কারণ তার মাথার ছোট ছোট শিঙের অগ্রভাগ থাকে ভিতর দিকে বাঁকানো, ফলে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কয়েক বছর আগে ভারতীয় সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ পত্রালাপ প্রকাশিত হচ্ছিল, যদিও তার কোন সমাধান হয় নি। এর বিষয়বস্তু হল, রুরু হরিণ মাঝে-মাঝে যে অদ্ভুত খট্-খট্ শব্দ করে থাকে। কেউ কেউ বলেন, শব্দটা যখন কেবলমাত্র রুরুর দৌড়ের সময়েই শোনা যায় তখন বুঝতে হবে যে তার কারণ, তার পায়ের দুটো করে জোড়। আবার কেউ কেউ বলেন, এর কারণ হল, কুকুরে দাঁতদুটোর কোন অজ্ঞাত কারণে ঠোকাঠুকি। এই যে দুটি কারণ দেখানো হয়েছে তাদের কোনটাই ঠিক নয়। শব্দটা আসে রুরুর মুখ থেকে। ঠিক যেভাবে শব্দ করা হয় সেভাবেই, এবং অনেক রকম পরিস্থিতিতেই এ শব্দ শোনা যায়: যথা, দৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা আছে, বা কোন শিকারী কুকুরের সাড়া পেয়েছে, কিংবা কোন সঙ্গীর পিছু-পিছু চলেছে। রুরুর সতর্কতাসূচক ডাক হল এক স্পষ্ট, ঝঙ্কৃত শব্দ, মাঝারি আকারের কোন কুকুরের ডাকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

রুরুটা যখন জল-পথটা পার হচ্ছে, তখন কীট-পতঙ্গভুক আর ফল-ভুক বিরাট একঝাঁক পাখি ডানদিক দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। এই ঝাঁকে আছে স্থানীয় পাখির সঙ্গে যাযাবর পাখিও। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দেখতে পাব পাখিগুলো আমাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে,—ওরা যখন জল-পথের দু-দিকের গাছগুলোর উপর বসবে কিংবা যখন উড়তে থাকবে তখন ওদের ভাল করে দেখবার সুযোগ হবে। পাখি যখন এমন জায়গায় বসে যেখানে পশ্চাৎপট বলে কিছু নেই বা আকাশই একমাত্র পশ্চাৎপট, তখন খুব কাছে না হলে

তাদের সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এইবার যে-সব পাখির ওড়া দেখতে পাব এবং যে ঝাঁকের প্রত্যেকটি প্রাণী হয় চলেছে বা শিস দিচ্ছে, তাদের মধ্যে আছে দু-জাতের সাতসতী। এরা থাকে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মগডালের সবচেয়ে উঁচু পাতায় আর গাছ বা ঝোপের কচি কচি ডালে, আর সেই সুবিধেজনক জায়গা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পতঙ্গ খেতে শুরু করে। সাতসতীদের সঙ্গে থাকে চার রকম কটকটে, যথা—সাদা-ভুরু চোখদয়াল, হলদে চোখদয়াল ইত্যাদি, দু-রকম কাঠঠোকরা; হরবোলা প্রভৃতি চার রকম বুলবুল; দুর্গাটুনটুনি প্রভৃতি তিন রকম টুনটুনি; তা ছাড়াও আরও অনেক রকম পাখি।

এইসব পাখির সংখ্যা দুই থেকে তিনশো। এছাড়াও ছিল একজোড়া কালোমুড়া সোনালি-হলদে পাখি, গাছ থেকে গাছে তারা পরস্পরকে তাড়া করে বেড়াত, আর ছিল একটা ছোটখাট ভিমরাজ; বড় ভিমরাজের মত অতটা মারমুখো না হলেও সে তার প্রহরার এলাকা থেকে প্রচুর রসালো পতঙ্গ গ্রাস করত। তার মধ্যে সর্বশেষ হল একটা মোটাসোটা শূককীট, একটা বেটেখাটো কাঠঠোকরা অনেক খেটে সেটাকে শুকনো গাছের ডাল থেকে বার করে এনেছিল। পাখির ঝাঁকটা এবার আমাদের মাথার উপর দিয়ে উঠে বাঁদিকের জঙ্গলের মধ্যে চলে;—একমাত্র শব্দ এখন ল্যাণ্টানার ঝোপের থেকে বন-মোরগের আঁচড়ানোর শব্দ, আর একমাত্র পাখি যা চোখে পড়ছে সে হল শা-বাজ,—শান্তভাবে, প্রচুর আশা নিয়ে সে শিমুল গাছের মগডালে বসে আছে।

ডানদিকে ল্যাণ্টানার ঝোপের পেছনে বাগানের মত খানিকটা ফাঁকা জায়গা, কুল-জাতীয় অনেক বড় বড় গাছ সেখানে। এই সময়ে ওদিক থেকে শোনা গেল একটা লাল বানরের সতর্কতাসূচক আওয়াজ আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই গোটা-পঞ্চাশ বিভিন্ন বয়সের আর বিভিন্ন আকৃতির বানরের উত্তেজিত ডাক। বোঝা গেল যে কোন চিতাবাঘ বেরিয়েছে, এবং যেহেতু সে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় রয়েছে তাই মনে হয় না সে চলেছে পাহাড়ের পাদদেশের কোন গভীর দরিপথে, দিনের গরম সময়টা চিতাবাগটা যেখানে গিয়ে কাটায়। কুলজাতীয় গাছগুলো ঘুরে একটা পথ আছে যেটা মানুষ ও পশু উভয়েরই চলার পথ। আরও দুশো গজ এগিয়ে এই পথটা আমাদের জলপথকে কেটে চলে গেছে। চিতাবাঘটার যখন এই পথে আসা একরকম নিশ্চিতই বলা চলে, তখন চলুন আমরা তাড়াতাড়ি শ-দেড়েক গজ এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের উঁচু তীরটায় হেলান দিয়ে বসি। জল-পথটা এখানে চওড়ায় পঞ্চাশ ফুট,—এর বাঁ তীরের গাছগুলোয় হনুমানের একটা বিরাট পাল থাকে। লাল বানরের সতর্কতাসূচক শব্দ এরা শুনেছে, এবং শুনে

গাছের সব মা-ই তাদের বাচ্চাদের ধরে রেখেছে। সকলের চোখ এখন যে দিক থেকে সাবধানী ডাকটা এসেছে সেদিকে।

এ পথের দিকে আপনার তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই, কারণ পথের সবচেয়ে কাছে যে গাছ তার শেষের ডালে যে হনুমানটা বসে আছে চিতাবাঘটা এলে সেই আপনাকে সতর্ক করে দেবে। চিতাবাঘ দেখলে বানররা যেমন করে হনুমানরা তেমন করে না। এর কারন হয়ত অধিক সঙ্ঘবদ্ধতা, কিংবা হয়ত তাদের আত্মীয় বানরদের তুলনায় স্বভাবের ভীরুতা। চিতাবাঘের দেখা পেলে দলের সব বানর একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে, আর সে-রকম সুবিধে থাকলে গাছ থেকে তাকে অনুসরণ করে চলে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত। হনুমানরা কিন্তু তা করে না। প্রহরী হনুমান চিতাবাঘের দেখা পেলেই 'খক্ খক্ খক্' করে সাবধান করে দেয়, আর যখন দলের সর্দার প্রহরীর নির্দেশ অনুসরণ করে চিতাবাঘের দেখা পেয়ে নিজেই ডাক শুরু করে, প্রহরী তখন থামে। তখন থেকে সাবধানী ডাক দেবে কেবল দলের সর্দার আর সবচেয়ে বুড়ো স্ত্রী-হনুমান —স্ত্রী-হনুমানের ডাকটা কতকটা হাঁচির শব্দের মত। কিন্তু চিতাবাঘটাকে অনুসরণের কোন চেষ্টাই হবে না। এবার প্রহরী হনুমানটা চার পায়ে দাঁড়িয়ে উঠবে। তারপর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে এপাশে ওপাশে বাঁকাবে। যখন সে নিশ্চয় হবে যে সে চিতা-বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছে, তখন ডেকে উঠবে সে, আর তার পেছন থেকে দু-একটা আতঙ্কগ্রস্ত হনুমানও সে ডাকে যোগ দেবে। এতক্ষণে সর্দারও এই ভয়ঙ্কর শত্রুর দেখা পেয়েছে। ডেকে উঠবে সেও. এবং মুহূর্ত-পরেই দলের বৃদ্ধাও ডেকে উঠবে হাঁচির মত শব্দ তুলে। বাচ্চারা এখন সবাই চুপচাপ, থেকে থেকে কেবল মাথা তুলছে আর নামাচ্ছে. আর মুখভঙ্গি করছে। অনুভূতির বশেই দলটা এতক্ষণে জেনেছে যে আজকের এই বসন্তের দিনে তাদের চিতাবাঘের ভয় নেই, কারণ খিদে যদি পেত তাহলে সে এভাবে ফাঁকায় বেরিয়ে না এসে হয় আরও উপরে নয় আরও নিচে কোথাও জল পথটা পার হয়ে অদৃশ্য থেকে অগ্রসর হত। তৎপরতায় আর ওজনে প্রায় একই রকমের সে, তাই হনুমানদের ধরতে তার কোন অসুবিধেই হয় না। কিন্তু লাল বানরের ব্যাপারটা আলাদা, দরকার হলে তারা সরু ডালেরও উপরে উঠে পড়তে পারে, যেখানে চিতাবাঘ তার ভারি শরীর নিয়ে উঠতে সাহস করে না।

চিতাবাঘটা এখন মাথা উঁচু করে পঞ্চাশ গজ ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে চলেছে, অপূর্ব ফুটকি দেওয়া তার শরীরে সকালের সূর্যের আলো এসে পড়েছে। যে বৃক্ষ শ্রেণীর দিকে সে চলেছে সেখানকার ডালে ডালে যে সব হনুমান ভিড় করে

রয়েছে তাদের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে না। একবার থামল সে, তারপর জলপথের দুদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার তেমনি ধীরভাবে এগিয়ে গেল। তাকে পিঠ দিয়ে আমরা নিস্পন্দ বসে আছি, আমাদের দেখতে পায় নি সে। খাড়াই তীর বেয়ে উঠে সে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ হনুমান-সর্দার আর বুড়ো হনুমানটা তাকে দেখতে পাবে ততক্ষণ তারা জঙ্গলের প্রাণীদের সতর্ক করতে থাকবে।

এবার চিতাবাঘটার চিহ্নটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। পথটা যেখানে জল-পথটাকে কেটে গেছে সেখানকার মাটি লাল, খালি-পা মানুষের পায়ের চাপে চাপে শক্ত হয়ে গেছে। এই মাটির উপর সূক্ষ্ম সাদা ধুলোর আস্তরণ থাকায় তা আমাদের কাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধেজনক হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক যে আমরা চিতাবাঘটাকে দেখি নি, না জেনে এখানে এসে পড়েছি। প্রথমেই যা আমাদের চোখে পড়ে তা হল, পায়ের দাগগুলো দিব্যি টাটকা বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং বেশিক্ষণ হয় নি ওগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এ ধারণা আমাদের হয়েছে এই থেকে যে, এই ধুলোর আস্তরণের উপর যেখানে চিতাবাঘটার পায়ের ছাপ পড়েছে সেখানটা চ্যাপ্টা আর মসৃণ হয়ে বসে গেছে আর পায়ের পাতার আর আঙুলের ছাপ ঘিরে যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট, আর মোটামুটি সিধে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাওয়া আর রোদ লেগে আবার ধুলোর স্তূপটা উঁচু হতে থাকবে, দেওয়াল-গুলো ভেঙে পড়বে। পিঁপড়ে এবং অন্যান্য অনেক কীট পতঙ্গ এই পথ অতিক্রম করে যাবে, ধুলো জমতে থাকবে। ঘাস আর শুকনো পাতার টুকরো হাওয়ায় উড়ে বা অন্যভাবে এখানে এসে পড়বে; কালক্রমে দাগটা অদৃশ্য হয়ে যাবে একেবারে। কোন দাগ দেখে সেটা কত পুরোনো তা বিচার করার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, সে দাগ বাঘের বা চিতাবাঘেরই হোক কিংবা সাপের বা হরিণেরই হোক। কিন্তু ভাল করে নজর করলে, আর চিতাবাঘটার অবস্থিতির কথা ভেবে দেখলে—অর্থাৎ সেটা ফাঁকা জায়গায় না কোন কিছুর আড়ালে, দিনের বা রাতের কোন্ সময়ে, কোন্ কোন্ কীট পতঙ্গ চলাফেরা করে, বাতাস সচরাচর কোন্ সময়ে বইতে থাকে, কোন্ সময়ে সচরাচর শিশির পড়ে বা পাতা থেকে ঝরে—এ সমস্ত ঠিকমত বিবেচনা করে দেখলে, দাগটা কোন্ সময়ে হয়েছে তার মোটামুটি সঠিক একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয় করে জেনেছি যে দাগটা টাটকা, কিন্তু এ বিষয়ে এইটিই একমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা নয়। এখন আবার দেখতে হবে চিতাবাঘটা পুরুষ না স্ত্রী, যুবক না বৃদ্ধ, বড় না ছোট। পায়ের দাগ যে-রকম গোল তাতে বোঝা

যাচ্ছে, এ হল পুরুষ-চিতাবাঘ। পায়ের পাতায় কোন ফাটল বা ভাঁজ না-থাকায়, পায়ের আঙুলগুলো গোল-গোল হওয়ায়, আর সমস্ত দাগটার মধ্যে একটা নিটোল ভাব থাকায় বোঝা যায় যে চিতাবাঘটা অল্পবয়স্ক। আর আকৃতির বিচার করতে গেলেও পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে পায়ের দাগ থেকে তা আন্দাজ করা সম্ভব। এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হলে তখন বাঘ বা চিতাবাঘের মাপ তার পায়ের ছাপ থেকে প্রায় নির্ভুল আন্দাজ করা যায়,—ভুলের সম্ভাবনা দু-এক ইঞ্চির বেশি থাকে না। মির্জাপুরের কোলদের বাঘের মাপের কথা জিজ্ঞাসা করলে একটা ঘাসের শিস নিয়ে তার পায়ের ছাপটা মেপে নেয়, তারপর ঘাসটা মাটিতে রেখে হাতের আঙুল দিয়ে মেপে দেখে। এই উপায়ে ওরা কতটা নির্ভুল হতে পারে জানি না, তবে, পায়ের ছাপের মোটামুটি আকৃতি দেখে আমি কোন জন্তুর দৈর্ঘ্য ও আকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিই, কারণ এ ছাড়া যে-কোন উপায়ই গ্রহণ করা হোক তা নিছক একটা আন্দাজ ছাড়া কিছু নয়।

পথটা যেখানে জল-পথটাকে কেটে চলে গেছে সেখানটা ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে গেলে খানিকটা শক্ত বালিভরা জমি, তার এক দিকে পাথর আর অপর দিকে উঁচু তীর। এই বালির উপর দিয়ে একপাল চিতল হরিণ চলে গেছে। চিতল বা সম্বরের পালে কটা প্রাণী আছে তা গণনা করা আর তাদের প্রত্যেকটিকে লক্ষ্য করা সব সময়েই চিত্তাকর্ষক। এতে করে পরবর্তীকালে এই পালটাকে চেনা সম্ভব হয় এবং তাতে করে জানতে পারা যায় দলের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে কি না। তা ছাড়া এতে করে পালটার প্রতি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ বোধও জন্মায়। পালটা ফাঁকায় থাকলে তার সংখ্যায় কটা পুরুষ তা গণনা করা, তাদের শিঙের দৈর্ঘ্য বা আকৃতি লক্ষ্য করা, কিংবা কটা হরিণী বা বাচ্চা আছে তা গণনা করা কঠিন নয়। কিন্তু যখন একটামাত্র হরিণ দেখা যায় আর অন্যগুলো আড়ালে থাকে, তাদের আড়াল থেকে বার করে আনার এই ব্যবস্থাগুলি দশ বারের মধ্যে ন-বারই সফল হতে দেখা গেছে। যে হরিণটা দেখা যাচ্ছে, যতটা যুক্তিসঙ্গত ততটা পর্যন্ত সেটার পিছু নেবার পর কোন গাছ বা ঝোপের পেছনে লুকিয়ে পড়ে চিতাবাঘের ডাক ডেকে উঠতে হবে। সব জন্তুই শব্দের উৎপত্তি নিখুঁতভাবে আন্দাজ করতে পারে ; তাই যখন দেখা যাবে হরিণটা সেদিকে তাকাচ্ছে, গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে কাঁধটা একটুখানি বার করে আস্তে দু-একবার উপরে নিচে দোলাতে হবে, কিংবা ঝোপ হলে তার কয়েকটা পাতা নাড়তে হবে। নাড়াচাড়াটা লক্ষ্য করলেই হরিণটা ডাকতে শুরু করবে, আর তার দলের সকলে বেরিয়ে এসে তার দু-দিকে সার বেঁধে দাঁড়াবে। এইভাবে এমনও হয়েছে যে দলের পঞ্চাশটা চিতলই আমায়

দেখা দিয়েছে আর আমি প্রচুর সময় নিয়ে তাদের ফোটো তুলেছি। তবে, একটু সাবধান করে দিচ্ছি। কখনো চিতাবাঘের ডাক ডাকবেন না যতক্ষণ না একেবারে নিশ্চিত হচ্ছেন যে বনের সে অঞ্চলে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই; এবং সে ক্ষেত্রেও চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। কারণ বলছি। একদিন রাত্রে আমি একটা চিতাবাঘের ডাক শুনতে পেলাম। বার-বার ডাকছিল চিতাবাঘটা। তার আওয়াজ শুনে বুঝলাম সে বিপন্ন। পরদিন আলো ফোটার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লাম কী তার হয়েছে খোঁজ করতে। সে যেদিক থেকে ডাকছিল রাত্রের মধ্যে কখন চলে গেছে সেদিক থেকে। তখনও ডেকে চলেছে সে, তা থেকে বুঝলাম সে এখন আছে খানিকটা দূরের এক পাহাড়ে। পশুর পায়ে-চলা পথ ধরে একটা ফাঁকা-মত জায়গায় পৌঁছলাম। এখান থেকে চিতাবাঘটাকে দেখতে পাব সে আমায় দেখতে পাবার আগে। সেখানে একটা সীমানা-নির্দেশক থামের আড়ালে শুয়ে পড়ে আমি সে-ডাকের সাড়া দিলাম। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলল এই ডাকা আর তার সাড়া পাওয়া। এগিয়ে আসছে চিতাবাঘটা, কিন্তু আস্তে আস্তে, এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে। শেষ পর্যন্ত যখন সে আমার একশো গজের মধ্যে এসে গেল তখন আমি ডাক বন্ধ করলাম। চিতাবাঘটার প্রতীক্ষায় আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম হাতের উপর থুতনি রেখে, এমন সময় পেছনে পাতার খস-খস শব্দ শুনে মাথা ফিরিয়ে তাকাতেই একটা বন্দুকের নল সোজা আমার চোখে পড়ল।

আগের দিন রাত্রে নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার ক্যাসেল্‌স্‌ আর কর্নেল ওয়ার্ড বন-বাংলোয় এসেছিলেন এবং আমার অজান্তে তাঁরা একটা চিতাবাঘের বাচ্চাকে গুলি করেন। রাত্রে তার মায়ের ডাক শোনা যায়। ঠিক ভোরবেলায় ওয়ার্ড একটা হাতি করে তাকে মারতে বেরিয়ে পড়েন। মাটিতে শিশির ছিল, আর মাহুতটি ছিল সুশিক্ষিত। নিঃশব্দে সে হাতি নিয়ে এগিয়ে এল যতক্ষণ না তার আর আমার মধ্যে কেবলমাত্র একসারি গাছের ব্যবধান রয়েছে। ওয়ার্ড আমাকে সেখানে দেখতে পেতেন হয়ত, কিন্তু প্রথমত সে বয়স আর তাঁর ছিল না, তার উপর আবার ভোরের আলোও খুব স্পষ্ট ছিল না; ফলে যখন তিনি তাঁর রাইফেলের সাইটটা ঠিক করে আমার কাঁধে লক্ষ্য স্থির করতে পারলেন না তখন ইঙ্গিতে হাতিটাকে এগিয়ে যেতে বললেন। আমাদের ভাগ্য ভাল যে গাছপালা ডিঙিয়ে হাতিটা যখন আমার মাত্র দশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে আর মাহুতের ইঙ্গিতে (সেও বৃদ্ধ) ওয়ার্ড দ্বিতীয়বার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় হাতিটা একটা নোয়ানো ডালে পা দিল আর শব্দ পেয়ে আমি মাথা

ফেরাতেই একটা ভারি বন্দুকের নল আমার একেবারে চোখের সামনে দেখা দিল।

চিতল হরিণের যে পালটার চিহ্ন অনুসরণ করে আমরা চলেছি, আগের দিন সন্ধ্যায় তারা বালি-ভরা জমিটার উপর দিয়ে চলে গেছে। এটা বোঝা যায় রাতের যে-সব কীট পতঙ্গ এটা অতিক্রম করে গেছে তা থেকে, আর ঝুলে-পড়া একটা গাছ থেকে যে শিশির পড়েছে তা থেকে। দলটা হয়ত ইতিমধ্যে এক মাইল কি পাঁচ মাইল দূরে চলে গেছে,—হয়ত কোন ফাঁকা জায়গায়, কিংবা কোন ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে। তবুও কিন্তু গুনে দেখা যায় পালে কটা ছিল,—বলছি, কিভাবে। ধরা যাক, কোন চিতল হরিণের দাঁড়ানো অবস্থায় সামনের আর পেছনের পায়ের খুরের দূরত্ব ত্রিশ ইঞ্চি। এবার একটা কাঠ দিয়ে বালির উপর এই চিহ্নের সমকোণে একটা রেখা টানুন। এই রেখা থেকে ত্রিশ ইঞ্চি মেপে নিন,—কাজটা কঠিন হবে না, কারণ আপনার জুতো দশ ইঞ্চি লম্বা। এবার এই রেখা থেকে প্রথম রেখাটার সমান্তরালে আর একটা রেখা টানুন। এবার কাঠিটা নিয়ে গুনে দেখুন এই দুই রেখার মধ্যে কতগুলো খুরের চিহ্ন আছে, আর সেইসঙ্গে প্রতিটি দাগ বরাবর কাঠিটা দিয়ে একটা করে চিহ্ন করে যান। ধরুন, গুনে দেখলেন, ত্রিশ। এই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে ভাগ করুন, তাহলেই আপনি একরকম নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবেন যে আগের দিন সন্ধ্যায় পনেরোটা চিতলের একটা দল এখান দিয়ে চলে গেছে। বন্য বা গৃহপালিত যে-কোন জন্তুর মাপ নেবার বেলায় এ পদ্ধতি কার্যকরী হবে, তবে, খুব বেশি সংখ্যায় হলে হয়ত নিখুঁত হবে না,—ধরুন দশটা পর্যন্ত; তার বেশি হলে নিখুঁত না হলেও তার কাছাকাছি হবে—যদি অবশ্য সামনের পা আর পেছনের পায়ের দূরত্বটা জানা থাকে। ছোট ছোট প্রাণী—যথা বনকুত্তা, শুয়োর বা ভেড়ার ব্যাপারে এই দূরত্ব হবে ত্রিশ ইঞ্চির কম, আর সম্বর বা গৃহপালিত গরু-মোষের ব্যাপারে ত্রিশ ইঞ্চির বেশি।

জঙ্গলে যুদ্ধের শিক্ষাকালে যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন না তাঁদের অবগতির জন্যে বলছি, জঙ্গলে মানুষের পায়ের চিহ্ন থেকেও অনেক খবরই সংগ্রহ করা সম্ভব,—সে চিহ্ন রাস্তার উপরে পশু-চলা পথে বা অন্য যেখানেই হোক না কেন। ধরা যাক আমরা কোন শত্রুর এলাকায়, কোন পশু-চলা পথের উপরে এসে পড়েছি যেখানে পায়ের চিহ্ন আছে। পদচিহ্নগুলো দেখে তাদের পরিমাপ, তাদের আকৃতি, কাঁটা আছে কি না, গোড়ালিতে লোহা আছে কি নেই, জুতোর সোল চামড়ার না রবারের ইত্যাদি জেনে নিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে এই চিহ্ন আমাদের জুতোর নয়, শত্রুপক্ষের। এ বিষয়ে নিশ্চয় হবার পর এখন আমাদের দেখতে হবে তারা কখন এখান দিয়ে গেছে, এবং দলে ক-জন ছিল। সময়টা কিভাবে হিসেব

করতে হবে তা আপনারা জানেন। এবার সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হলে আমাদের এই চিহ্ন কেটে একটা রেখা টানতে হবে, আর এই রেখার উপর এক পায়ের আঙুলগুলো রেখে ত্রিশ ইঞ্চির একটা পা ফেলতে হবে। তারপর সেই চিহ্নের উপর দিয়ে আর-একটা রেখা টানতে হবে। এই দুই রেখার মধ্যবর্তী গোড়ালির ছাপগুলো থেকে আরও অনেক চিত্তাকর্ষক জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব। তাদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হল, কত বেগে তারা এখান থেকে চলে গেছে। স্বাভাবিক পদক্ষেপে চলবার সময় মানুষের শরীরের ওজন সমভাবে তার পদচিহ্নের উপর পড়ে, এবং পদক্ষেপের দূরত্বটা হয় মানুষের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ত্রিশ থেকে বত্রিশ ইঞ্চি। গতি যত বাড়িয়ে দেওয়া হয় গোড়ালির চাপ তত কমতে থাকে আর আঙুলের চাপ তত বাড়তে থাকে, এবং পদক্ষেপের দূরত্বও তত দীর্ঘ হতে থাকে। এই অবস্থা ক্রমেই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বেগে দৌড়ের সময়ে কেবলমাত্র গোড়ালির সামান্য ছোঁয়া, আর আঙুলের ছাপ মাটিতে ফুটে ওঠে। মানুষ অল্প-সংখ্যক হলে—অর্থাৎ একশো কুড়ি থেকে দেড়শোর মধ্যে হলে হিসেব করা সম্ভব তার মধ্যে কেউ খুঁড়িয়ে চলছে কি না, এবং কেউ আহত হয়েছে কি না তা আন্দাজ করা যায় রক্তের দাগ থেকে।

জঙ্গলে কখনো কেটে-কুটে গেলে একটা ছোট, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর চারা-গাছের খবর আপনাদের দিতে পারি যা শুধু রক্ত বন্ধ করবে না, আমার জানা যে-কোন ওষুধের চেয়ে ভালভাবে সারিয়ে তুলবে। সব জঙ্গলেই এ গাছ পাওয়া যায়। লম্বায় এ হয় বারো ইঞ্চির মত, আর এর লম্বা সরু বোঁটায় যে ফুল ফোটে তা দেখতে কতকটা ডেইজির মত। এর পাতাগুলো শ্যামলো, আর ক্রিসান্থিমামের পাতা যেমন, তেমনি করাতের মত আকৃতির। কয়েকটা পাতা নিয়ে প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, তারপর আঙুলের চাপ দিলেই হল, ক্ষতস্থানে রস পড়বে। প্রচুর রস লাগাবেন, ব্যস আর কোন চিকিৎসার দরকার হবে না; এবং ক্ষতটা বিশেষ গভীর না হলে দু-একদিনেই সেরে যাবে। নামটাও সার্থক, 'ব্রহ্ম বুটি' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের ফুল'।

যুদ্ধের ক-বছর আপনাদের অনেকেই ভারত ও ব্রহ্মের জঙ্গলে আমার সঙ্গে ছিলেন। আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল। যদি আমি তখন সময়ের অভাবে আপনাদের বেশি খাটিয়ে থাকি তো নিশ্চয় এতদিনে আপনারা আমাকে ক্ষমা করেছেন। এবং তখন যা আমরা একসঙ্গে শিখেছি নিশ্চয় সে সব ভুলে যান নি। যথা, কোন্ কোন্ ফুল আর ফল খাওয়া নিরাপদ, খাবার যোগ্য শেকড় কোথায় মিলতে পারে, চা আর কফির অভাবে কী খাওয়া যেতে পারে,—জ্বর-জারিতে,

ঘায়ে বা গলার ব্যথায় কোন্ চারা গাছ বা কোন্ গাছের ছাল খেতে হবে, খাটিয়ার জন্যে কোন্ লতার ব্যবহার চলবে, ভারি মালপত্র বা বন্দুক কোন্ লতায় বেঁধে নদী বা দরি পার হতে হবে, কিভাবে চললে পায়ে ফোস্কা পড়বে না, কিভাবে আগুন জ্বালাতে হবে, ভিজে বনে কিভাবে শুকনো কাঠ মিলবে, বন্দুক না নিয়ে কিভাবে শিকার করা সম্ভব, উপযুক্ত পাত্র না থাকলেও কিভাবে চা করা যাবে, নুনের অভাব কিসে মিটবে কী করে সাপের কামড়ের, ঘায়ের বা পেটের অসুখের চিকিৎসা হবে, এবং শেষ পর্যন্ত, কিভাবে জঙ্গলের মধ্যে শরীর ঠিক রাখা যাবে আর সমস্ত বন্য প্রাণীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করা যাবে। এ সমস্ত, এবং এইরকম আরও অনেক কিছুই আপনারা আর আমি—ভারতের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চল থেকে, ব্রিটেনের নগর গ্রাম থেকে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ থেকে একসঙ্গে শিখেছি। বাকি জীবনটা জঙ্গলে জঙ্গলে কাটাব এ উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের আর পরস্পরের মধ্যে সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে, অজানার ভয়কে জয় করতে আর শত্রুকে দেখাতে যে তাদের চেয়ে মানুষ হিসেবে আমরা উচ্চস্তরের। তবে, যা কিছু শিখেছি সে সবই অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ; কারণ প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডারের না আছে কোন শুরু না আছে কোন সমাপ্তি।

প্রভাতের অনেকটা সময়ই এখনো আমাদের হাতে রয়েছে। এইমাত্র আমরা এসে পৌঁছেছি পাদশৈল অঞ্চলে, সমতল ভূমি পার হয়ে। এখানকার উদ্ভিদ সেখানকার থেকে আলাদা। এখানকার বহুতর বট আর ফুল গাছে ফলের লোভে অনেক রকমের পাখির আড্ডা বসে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হল বড় বড় ধনেশ পাখি। একটা অদ্ভুত অভ্যাস এদের হল মাদি পাখিদের বাসায় আটকে দেওয়া। এর ফলে মদ্দা পাখিদের উপর একটা ভীষণ চাপ পড়ে, কারণ পেটে ডিম থাকা অবস্থায় মাদিরা ভয়ঙ্কর মোটা হতে থাকে এবং ডিম পাড়ার পর—সচরাচর তারা দুটো ডিম পাড়ে—তাদের ওড়ার ক্ষমতা থাকে না। পুরুষকে তখন সমস্ত পরিবারের জন্যে খাদ্য সংস্থানের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। বেঢপ চেহারা, শব্দযন্ত্র-লাগানো প্রকাণ্ড ঠোঁট আর ভারি শরীর নিয়ে কষ্ট করে ওড়া—এসব দেখে মনে হয় যেন অভিব্যক্তির ক্রমপর্যায়ে তাদের কোন স্থান নেই। বাসার মুখ এঁটে দেওয়া আর ছোট্ট একটা ফাঁক রাখা যেখান দিয়ে মাদি ধনেশ ঠোঁটের আগাটা মাত্র গলিয়ে দিয়ে মদ্দার নিয়ে আসা খাবার খেতে পারে—এ অভ্যাস সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে যখন আজকের দিনের চেয়ে তার শত্রু ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ফাঁপা গাছের ভিতরে বা গাছে ফোকর তৈরি করে যে-সব পাখি বাসা বাঁধে তাদের সকলের শত্রু এক। এদের মধ্যে কয়েক জাতের

প্রাণী একেবারেই অসহায় ও নিরস্ত্র; তাই প্রশ্ন ওঠে, কেন তাহলে কেবলমাত্র ধনেশ পাখি, শক্তিশালী একজোড়া ঠোঁট থাকায় যার আত্মরক্ষার শক্তি বরং সকলের চেয়ে বেশি, এভাবে তার বাসা বন্ধ করে থাকে? ওর আর একটা অভ্যাস যা অন্য কোন পাখির মধ্যে আমি দেখি নি তা হল, রঙ দিয়ে নিজের পালক সাজানো। রঙটা হল হলদে, এবং রুমাল দিয়ে মুছলেই উঠে যায়; এটা থাকে ল্যাজের উপরের একটা ছোট থলেতে। দুই ডানার প্রস্থের উপর সে এটা ঠোঁটে করে মাখিয়ে দেয়। বৃষ্টি হলেই যা ধুয়ে যায় এমন জিনিস কেন ধনেশ তার পিঠে লাগায় জানি না,—একমাত্র যুক্তি যা আমার মনে হচ্ছে সে হল শত্রুর আক্রমণ এড়াবার জন্যে আত্মগোপনের চেষ্টা,—কোন সুদূর অতীতে যার প্রয়োজন হয়েছিল। আজকের দিনে তার একমাত্র শত্রু হল চিতাবাঘ,—এবং যে চিতাবাঘ রাত্রে শিকার করে এ-হেন আত্মগোপন-প্রচেষ্টা তার বিপক্ষে কার্যকরী হয় না।

ধনেশ ছাড়া আরও অনেক ফলাহারী পাখি এইসব বট আর ফুল গাছে বাসা বাঁধে। এদের মধ্যে আছে দু-রকম হারিয়াল, দু-রকম বসন্তবাউরি, চার রকম বুলবুল প্রভৃতি। সাদামুড়ি ছোট পেঁচারা তাদের সু-উচ্চ বাসা ছেড়ে যায় সব পাখির শেষে, আবার ফিরেও আসে সব পাখির আগে।

বটগাছগুলোর কাছে আছে একটা দাবানল-পথ,—এটাকে কেটে গেছে সেই বহু-ব্যবহৃত প্রাণী-চলার পথটা যেটা সিধে পাহাড় বেয়ে সেই ভোল পর্যন্ত গেছে যেটার কাছে ঝরনার জল জমে একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভোল আর এই জলাশয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আছে একটা গাছের গুঁড়ি। একটা বেঁটে-খাটো কুসুম গাছ এখানে ছিল, চোরা শিকারীরা এর ডালে বার-বার মাচান বাঁধত। ভোলে বা জলাশয়ে গুলি করা নিষেধ, কিন্তু চোরা-শিকারীরা শিকারের নিয়ম মেনে চলে না; তাই যখন বার-বার মাচান ভেঙে দিয়েও কোন কাজ হল না তখন আমি কেটেই দিলাম গাছটা। শুনেছি নাকি মাংসাশী প্রাণীরা ভোলে কিংবা জলাশয়ে প্রাণ বধ করে না। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মাংসাশী প্রাণীদের যতই বিচার-বিবেচনা থাকুক, ভারতে কিন্তু। ভোলে হত্যা করায় তাদের বিবেকে বাধে না। বলতে কি, তারা এইসব জায়গাতেই হত্যা করে বেশি,—এ বুঝতে পারবেন, এই ভোলে, এবং যে-সব ভোলে হরিণ আর বানর থাকে সেইসব ভোলের কাছাকাছি ছড়ানো আর শজারুর অংশত খেয়ে ফেলা হাড় আর শিঙ থেকে।

চলুন এবার ভোলের উপরকার পাহাড় বেয়ে উঠি যেখান থেকে পাদশৈল আর সেখানকার জঙ্গল দেখা যেতে পারে। আমাদের সামনেই সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল যেখান থেকে আমরা এইমাত্র সেই জলাশয়টার কাছে এসে পড়েছি যেখান থেকে

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। এ বন প্রকৃতির হাতে গড়া,—কারণ এখানকার কাঠের দাম কম বলে এ মানুষের সর্বধ্বংসী হাত এড়িয়ে গেছে। সামনে যে হালকা সবুজ ঝোপ দেখা যাচ্ছে এ হল শিশু গাছের চারা,—এর জন্ম হয়েছে পাদশৈল থেকে বন্যার জলে ধুয়ে আসা বীজ থেকে। এই চারা পরবর্তীকালে পরিণত আকার লাভ করে গরুর গাড়ির চাকা বা আসবাবপত্র তৈরির ব্যাপারে সেরা কাঠ হিসেবে গণ্য হয়। ঘন সবুজ যে ঝোপগুলির মধ্যে লাল ফলের কাঁদি দেখছেন ওগুলো হল রুনি গাছ। ও থেকে আসে সেই মসৃণ চূর্ণ, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যার নাম কমলা। গরিব মানুষরা যখন পাখিদের মত খাবারের আশায় আর শীতের ভয়ে উঁচু পাহাড় থেকে পাদশৈলে নেমে আসে, তখন তারা কাজ থেকে একটি দিন ছুটি নিয়ে ছেলে-বুড়ো সবাই কমলার সন্ধানে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। কমলা হল এক ধরনের লাল রেণু—এই রেণু রুনি ফলের গায়ে লেগে থাকে। এ সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে গাছের ডাল কেটে নিতে হবে, তারপর ফলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে একটা বড় ঝুড়িতে রেখে সেখানে ঘষতে হবে। রেণুগুলো তখন ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়বে কোন চিতল হরিণের চামড়া বা একফালি কাপড়ের উপর। ফল যখন প্রচুর, সংসারের পাঁচ জন—স্বামী-স্ত্রী আর তিন ছেলে মেয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে দু-সেরের মত এই রেণু সংগ্রহ করতে পারে যার দাম বাজার অনুযায়ী এক টাকা থেকে দু-টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভারতে ও মধ্য-প্রাচ্যে এই রেণুর ব্যবহার হয় পশম রঙ করতে, এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা এর সঙ্গে ইঁটের গুঁড়ো মেশানো শুরু করবার আগে মাখন রঙ করার জন্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এর বহুল প্রচলন ছিল। ওষুধের কাজেও এর ব্যবহার আছে,—সরষের তেলে রুনির ফল সেদ্ধ করে উপকার পাওয়া যায়।

শিশু আর রুনি গাছের মধ্যে-মধ্যে আছে খয়ের গাছ,—পালকের মত যার পাতা। শুধু লাঙলের ফলা তৈরির কাজেই নয়, উত্তর প্রদেশের হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ এর সাহায্যে এক কুটিরশিল্পে লিপ্ত হয়। এই শিল্প শীতকালীন, চার মাস ধরে দিনরাত্রি মানুষ পরিশ্রম করে চলে। এ থেকে হয় পানে খাওয়ার খয়ের, আর সেইসঙ্গে ফাউ হিসেবে পাওয়া যায় খাকি রঙ—পোশাক বা মাছ-ধরা জাল রাঙানোর কাজে যার ব্যবহার। আমার যতদূর ধারণা মীর্জা নামে আমার এক বন্ধুই প্রথম এর এই গুণ আবিষ্কার করে এবং তা নিতান্ত ঘটনাচক্রেই হয়ে থাকে। একটা লোকের পাত্রে খয়ের সেদ্ধ হচ্ছিল আর মীর্জা তা ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, এমন সময় তার সাদা রুমালটা পড়ে যায় সেখানে। একটা কাঠ দিয়ে রুমালটা তুলে ফেলে মীর্জা কাচতে দেয় সেটা। কিন্তু কেচে আসার পর যখন মীর্জা দেখল

কমলের দাগ একটুও ওঠে নি, তখন সে ধোপাকে ধমক দিয়ে আবার সেটা কাচতে দিল। কিন্তু ধোপা ফিরে এসে বললে যে দাগ ওঠাবার যত পদ্ধতি তার জানা আছে সব প্রয়োগ করেও সে এ দাগ ওঠাতে পারে নি। মীর্জা তখন বুঝল যে সে একটা পাকা রঙ আবিষ্কার করেছে। ইজ্জতনগরে তার তৈরি ফ্যাক্টরিতে এখন দিব্যি এ কাজ চলছে।

সবুজের অনেক রকম-ফেরের সঙ্গে (কারণ প্রত্যেক গাছেরই একটা নিজস্ব রঙ আছে) দেখা যায় উজ্জ্বল কমলা, সোনালি, গোলাপি, লাল ইত্যাদি রঙের সমারোহ। যে গাছের কমলা রঙের ফুল তার নাম ঢাক, এ থেকে যে পদ্মরাগ রঙের আঠা বেরোয় তা দিয়ে সবার সেরা রেশম রঙ করা হয়। এখানে আছে সোনালি ফুল যার নাম আলতাস, এর দু-ফুট লম্বা বেলনাকৃতি বীজাধারের মিষ্টি রসে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়,—কুমায়ুনের সর্বত্রই এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। আর আছে রক্তকাঞ্চন, যার ফুল হালকা বেগুনি রঙের। গোলাপি ফুলগুলো হল কুসুম গাছের,—আর হালকা থেকে ঘন-গোলাপি যেগুলো স্তূপীকৃত দেখা যাচ্ছে সেগুলো কোন ফুল নয়, কচি-কচি পাতা। লাল ফুলগুলো হল শিমুল গাছের,—ফুলের মধুপায়ী সব রকম পাখির, আর যত বানর আর হরিণ আর শুয়োর এই শাঁসালো ফুল খায় তাদের অত্যন্ত প্রিয়। কিছুকাল পরে ফুলগুলি খসে গিয়ে শুধু শক্ত বীজাধারটা রয়ে যায়। এপ্রিল মাসে যখন গরম বাতাস বইতে থাকে তখন এগুলো ফেটে উড়ে যায় মেঘের মত সাদা তুলো,—এর প্রত্যেকটি ভাগে থাকে একটা করে বীজ; প্রকৃতির উদ্যানকে আবার উদ্ভিদে ভরে তোলে। যে-সব বীজ পাখি বা পশু স্থানান্তরে নিয়ে যায় না সেগুলো আবার এমনভাবে তৈরি যাতে বাতাসে উড়ে দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে—যথা, নারকেল; খোসা থাকবার ফলে যা সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ঠেকে।

খালটার ওপারে আমাদের গ্রাম, সেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। উজ্জ্বল সবুজ আর সোনালি ছোপ থেকে বোঝা যাবে কোথায় গমের অঙ্কুর বেরোচ্ছে আর কোথায় সরষে খেত ফুলে ভরে উঠেছে। গ্রামের পাদদেশের সাদা রেখাটা হল সীমান্তের প্রাচীর, যা তৈরি করতে দশ বছর লেগেছিল,—দেওয়ালটার ওপারে বনের বিস্তার শেষ পর্যন্ত দিগন্তরেখায় গিয়ে মিশেছে। পূর্বে আর পশ্চিমে যতদূর চোখ যায় সীমাহীন বনের পর বন, আর আমাদের পেছনে শৈলশিরার পর শৈলশিরা শেষ পর্যন্ত চিরতুষার রাজ্যে পৌঁছেছে।

বিরাট হিমালয়ের ছায়ায় এই শান্ত সুন্দর পরিস্থিতিতে আমরা বসে আছি,

আমাদের ঘিরে বন বসন্তের নতুন সাজে সেজেছে। বাতাসের প্রতি তরঙ্গে ভেসে আসছে ফুলের সুগন্ধ। বহুতর পাখির গানের খুশিতে বাতাস স্পন্দমান। এখানে বসলে আমরা কিছুকালের জন্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্লেদ ভুলে প্রাণী-জগতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। কারণ এখানে জঙ্গলের আইন বিরাজমান,— স আইন মানুষের তৈরি আইনের থেকে শুধু পুরোনোই নয়, উৎকৃষ্টও বটে। এ আইনে প্রত্যেকের নিজের মত জীবন ধারণে অধিকার,— আগামী কালের চিন্তায় সেখানে কোন দুর্ভাবনা কোন উদ্বেগ কোন দুঃখের অবকাশ নেই। বিপদ সেখানে সকলেরই আছে ; কিন্তু তাতে বরং জীবনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি প্রাণী সর্বদা সতর্ক থাকলেও জীবন উপভোগে বাধা ঘটে না। আপনার চারদিকে যে আনন্দের পরিব্যাপ্তি তার আপনি এখন যথেষ্ট পরিচয় পাবেন, কারণ এখন আপনি শব্দের উৎস নির্ণয় করতে শিখেছেন, ডাক শুনে প্রত্যেকটি পশু-পাখিকে আলাদা করে চিনতে শিখেছেন এবং সে ডাকের কারণ জানতে পেরেছেন। বাঁ দিকে দূরে একটা ময়ূর জোড় বাঁধবে বলে ডেকে উঠল,—ডাকটা শুনে আপনি বুঝতে পারলেন যে সে পুচ্ছ মেলে নাচছে ময়ূরীর ঝাঁকটাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। আরও কাছে আছে এক বনমোরগ,— আশেপাশের সবকিছুকে অবজ্ঞা করে সে ডেকে চলেছে, আর সে ডাকের সাড়া যারা দিচ্ছে তাদের আওয়াজেও অবজ্ঞার ভাব সমান স্পষ্ট। লড়াই কিন্তু পারতপক্ষে ঘটে না, কারণ বনের মধ্যে লড়াই করা মানেই বিপদকে ডেকে আনা। দূরে ডানদিকে একটা পুরুষ সম্বর জঙ্গলকে সাবধান করে দিচ্ছে—সে দেখেছে একটা চিতাবাঘ শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। এই চিতাবাঘটাকে আমরা ঘণ্টাখানেক আগে দেখেছি। সমানে ডেকে যাবে সম্বরটা যতক্ষণ না চিতাবাঘটা সেদিনের মত ঘন ঝোপের মধ্যে চলে গিয়ে এইসব প্রহরীর দৃষ্টির অগোচর হয়ে যাচ্ছে। আমার নিচের একটা ঝোপ থেকে অনেকগুলো পাখি পত্রবহুল কুঞ্জের আড়ালে একটা ঘুমন্ত ঘুটকি পেঁচাকে আবিষ্কার করে সেই আবিষ্কার বন্ধুদের দেখাবার জন্যে ডাকছে। জানে তারা যে এই চিহ্নের কাছে এগোনো, এমনকি তার কানের কাছে চিৎকার করা পর্যন্ত এখন নিরাপদ, কারণ যখন সে বাচ্চা ছিল তখনই কেবলমাত্র সে কচিৎ কখনো দিনের আলোয় শিকার করেছে, তার পরে আর নয়। আর পেঁচাটাও জানে যে ওরা তাকে যতই ভয় বা ঘৃণা করুক তাদের থেকে তার কোন ভয় নেই এবং খেলা শেষ হলে আর তার ঘুমের ব্যাঘাত না করে নিজে থেকেই ক্লান্ত হয়ে চলে যাবে। বাতাসে কেবলই শব্দ আর শব্দ, কিন্তু প্রতিটি শব্দই অর্থপূর্ণ। ঐ যে নরম সুরটা কানে আসছে, সবচেয়ে চমৎকার যেটা, ওটা হল শ্যামার ডাক,—লাজুক সঙ্গীকে প্রেম নিবেদন

করছে। ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ শব্দটা হল একটা সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরার,—নতুন ডেরা গড়বে বলে একটা মরা গাছে গর্ত করে চলেছে। আর কর্কশ চিৎকারটা হল একটা পুরুষ চিতলের আওয়াজ,—প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংগ্রামে আহ্বান করছে। আকাশে অনেক উঁচুতে একটা তিলিয়া বাজ চিৎকার করে চলেছে, তারও উপরে এক ঝাঁক শকুনি স্থির হয়ে আকাশ পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছে। একজোড়া কাক শকুনিদের দেখিয়ে দেয় কোথায় একটা বাঘ তার মড়ি লুকিয়ে রেখেছিল—জায়গাটা হল একটা ঝোপ, সেই ঝোপটার কাছে এখন একটা ময়ূর নেচে চলেছে। আজও এখন উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে তারা সেইরকম সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় রয়েছে।

এখানে সদলে বা একা বসে আপনি পুরোমাত্রায় অনুভব করতে পারবেন জঙ্গলের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য আপনার কাছে কতটা এবং সে অভিজ্ঞতার ফলে অন্যের আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ কী পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। জঙ্গলকে আর আপনি কোন ভয় করেন না, কারণ আপনি জেনেছেন যে জঙ্গলে ভয় করবার মত কিছু নেই। প্রয়োজন হলে আপনি জঙ্গলে বাস করতেও পারেন, কিছুমাত্র অস্বস্তিবোধ না করেই ঘুমিয়েও থাকতে পারেন যেখানে খুশি। দিক নির্ণয় করতেও শিখেছেন, বাতাসের গতি সম্বন্ধেও সজাগ হয়েছেন,—কাজেই দিনে বা রাতে কোন সময়েই জঙ্গলে পথ হারাবার ভয় আর আপনার রইল না। দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করাটা প্রথমে খুব কঠিন হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আপনি জানেন যে আপনার দৃষ্টির পরিধি ১৮০ ডিগ্রি, এবং সেই পরিধির মধ্যে যে-কোন নড়াচড়া আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। জঙ্গলের যে-কোন প্রাণীর জীবনযাত্রার মধ্যেই আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন, কারণ তাদের ভাষা আপনি শিখেছেন, এবং শব্দের উৎস নির্ণয় করার ফলে তাদের প্রতিটি চলাফেরাও এখন আপনার আয়ত্তে। নিঃশব্দে চলাফেরা বা নির্ভুল গুলি করা এখন আপনি শিখেছেন; এবং যদি-বা কখনো কোন প্রাণীকে গুলি করতে হয় তাহলেও কোনরকম হীনমন্যতা আপনার মধ্যে থাকবে না, কারণ আপনি জানেন যে যত সুনামের অধিকারীই সে হোক না কেন তার চেয়ে আপনার জ্ঞান বেশি; তার কাছ থেকে কিছুই আপনার শেখবার নেই বা তাকে ভয় করবারও কিছু নেই।

এবার ফেরার পথ ধরতে হবে, কারণ অনেকটা পথ আমাদের সামনে, ম্যাগি প্রাতরাশ নিয়ে বসে থাকবে। ফিরব যে-পথে এসেছি সেই পথে, এবং যেখানে আমরা বালির উপর চিতলের পায়ের চিহ্নের হিসেব নিচ্ছিলাম সে জায়গা পার হয়ে, যে পথে চিতাবাঘটা জল-স্থল পার হয়েছিল সেটা পার হয়ে, পাদশৈল থেকে

যে পলিমাটি ধুয়ে এসেছিল, তাও পার হয়ে এসে এবার আমরা একটা গাছের ডাল টানতে টানতে নিয়ে যাব যাতে আমাদের কোন চিহ্ন না থেকে যায়, কারণ তাহলেই, কাল বা পরশু বা যেদিনই আমরা আবার শিকারে যাব, বুঝতে পারব যে যা কিছু চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ছে সে সমস্তই এই ক-দিনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

১২

জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে এমন একটা বোধ গড়ে উঠতে পারে যা আমাদের আদিম পুরুষ থেকে বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আসছে, যথাযথ নামের বদলে যাকে আমরা বলব, জঙ্গল-অনুভূতি। এই অনুভূতি, যা আসে জঙ্গলে বহুকাল বন্য জন্তুর নিবিড় সান্নিধ্যের ফলে, এ হল অবচেতন মনের বিকাশ, জঙ্গলের বিপদ সম্বন্ধে যা আমাদের সাবধান করে দেয়।

অনেকেই সাক্ষ্য দেবেন, অনির্দেশ্য এক আবেগের বশে কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা পেয়ে গেছেন—কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তা তাঁদের অবচেতন মনকে সাবধান করে দিয়েছে। কোন ক্ষেত্রে তা হয়ত কোন পথে অগ্রসর হতে বারণ করেছে,—দেখা গেছে মুহূর্তকাল পরেই সেখানে একটা বোমা ফেটে গিয়েছিল,—কোন ক্ষেত্রে আবার কোন বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চল থেকে সরে যেতে বলেছে পরমুহূর্তেই যেটা একটা গোলার আঘাতে ভেঙে পড়েছিল, আবার কখনো কোন গাছের তলা থেকে সরে যেতে বলেছে, পরমুহূর্তেই যে গাছে বাজ পড়েছিল। এতে করে যে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, সে বিপদ ছিল জানা, এবং আন্দাজ করা হয়েছিল। 'চৌগড় মানুষ-খেকো'র কাহিনীতে আমি অবচেতন মনের এই সাবধান করে দেবার দুটো উদাহরণ দিয়েছি। মানুষখেকোর আক্রমণ থেকে যে সময়ে আমায় বিরত করা হয় আমার সমস্ত মন তখন এই চিন্তায় একাগ্র হয়ে ছিল—কিভাবে মানুষখেকোটার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি। প্রথম বার বিরত করা হয়েছে একত্র জড় করা পাথরের ঢিবিটা থেকে, আর দ্বিতীয়বার একটা ঝুঁকে-পড়া পাথরের থেকে যেটার তলা দিয়ে আমার চলে যাবার কথা ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল যেমন স্বাভাবিক তেমনি সুবোধ্য। এবার আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে বিপদের সম্ভাবনা ছিল অজানা তবুও অবচেতন মন থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে,—এর একমাত্র ব্যাখ্যা যা আমার মনে আসে সে হল জঙ্গল-অনুভূতির চরম বিকাশ।

শীতের ক-মাস কালাঢুঙ্গিতে থাকতে মাঝে মাঝে আমি আমাদের প্রজাদের জন্যে একটা সম্বর বা চিতল হরিণ শিকার করতাম। একবার তাদের ক-জন এসে আমায় মনে করিয়ে দিল যে অনেকদিন আমি তাদের জন্যে কিছু শিকার করি নি। পরদিন একটা গ্রাম্য উৎসব ছিল, সেই উপলক্ষে তারা আমায় একটা চিতল মেরে দিতে অনুরোধ করল। এই সময় জঙ্গল অত্যন্ত শুকনো হওয়ায় শিকারের পিছু নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে, ফলে সূর্যাস্তের আগে কোন শিকার করা গেল না, কেবল একটা হরিণ ছাড়া। অন্ধকারে হরিণটাকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না ভেবে আমি চিতাবাঘের ভয়ে সেটা ঢাকাঢাকি দিয়ে রেখে ফিরে এলাম, ঠিক করলাম পরদিন ভোরে দল-বল নিয়ে গিয়ে ওটাকে আনব।

আমার বন্দুকের আওয়াজ গ্রাম থেকে শোনা গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে দেখলাম, জন দশ-বারো লোক দড়ি আর একটা মজবুত বাঁশ নিয়ে আমাদের কুটিরের সিঁড়িতে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওদের কথার উত্তরে জানালাম আমি হরিণ মেরেছি, আর বললাম পরদিন সূর্যাস্তের সময় গ্রামের গেটে আমার সঙ্গে দেখা করলে ওদের হরিণটার কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু ওরা সেদিন রাত্রেই হরিণটা নিয়ে আসবে বলে তৈরি হয়ে এসেছিল, তাই বললে যে আমি যদি বলে দিই কোথায় সেটা রয়েছে তাহলে ওরা গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে। আগে যখন আমি গ্রামবাসীদের জন্যে হরিণ মেরেছি, একটা চিহ্ন রেখে এসেছি। জঙ্গলটার সঙ্গে তারাও আমার মতই পরিচিত, তাদের এখন শুধু বলে দিলেই হবে কোন্ দাবানল-পথের, বা বন্য জন্তুর বা গরুর চলার পথের কাছে সে চিহ্ন। সেই চিহ্ন থেকে তারা আমার নিশানা অনুসরণ করে যাবে। শিকার-করা জীবজন্তু আবিষ্কারে এই পন্থা কখনো বিফল হয় নি। কিন্তু এক্ষেত্রে হরিণটা মেরেছি সন্ধ্যার পরে, অন্ধকার রাত্রে। ফলে কোন চিহ্ন রেখে আসা সম্ভব হয় নি। ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে-রাত্রেই হরিণটা ভাগ করে নিয়ে পরদিনের ভোজের ব্যবস্থা করতে। তাই ওদের হতাশ করতে আমার ইচ্ছে হল না। ওদের বললাম পাওয়ালগড়ের দাবানল পথ ধরে আড়াই মাইল পর্যন্ত গিয়ে সুপরিচিত হলদু গাছটার নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। ওরা বেরিয়ে চলে যেতে, ম্যাগি আমার জন্যে যে চা তৈরি করে এনেছিল তা খেতে বসলাম।

একজনের পেছনে একজন এইভাবে একদল মানুষের জঙ্গলের পথে চলতে যা সময় লাগে একা মানুষের সময় লাগে তার চেয়ে অনেক কম, তাই আমি তাড়াহুড়ো করি নি। বন্দুক নিয়ে যখন আমি বেরিয়ে পড়লাম তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। সেদিন আমাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনেক মাইল হাঁটতে হয়েছে,

কিন্তু আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকায় তার উপর আর পাঁচ মাইল বা ছ-মাইল বিশেষ কিছু অসুবিধের ছিল না। অনেকটা আগে বেরিয়ে পড়া সত্ত্বেও যখন আমি তাদের নাগাল ধরে ফেললাম, হলদু গাছটা তখনও খানিকটা দুরে। হরিণটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। তারপর সেটাকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেলে আমি একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে যাত্রা করলাম,—এতে করে পথ আধ-মাইল কম হল। বাড়ি যখন ফিরলাম তখন ডিনারের সময় হয়েছে। শুতে যাবার আগে স্নান করব, এই বলে আমি ম্যাগিকে ডিনারের ব্যবস্থা করতে বলে হাত-পা ধুতে গেলাম।

সেদিন রাতে হাত-পা ধোবার জন্যে জামা কাপড় খুলতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখি, আমার হালকা রবারের জুতো লাল ধুলোয় ভরে গেছে; দু-পায়েরই সেই অবস্থা। পায়ের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সাবধানী, যে কারণে পায়ের জন্যে আমায় কখনো ভুগতে হয় না। তাই বুঝলাম না এত অসাবধানী আমি কী করে হলাম। ছোটখাট জিনিসগুলো আমাদের স্মরণ-শক্তিকে বেজায় বিরক্ত করে, আর স্মরণ-শক্তিও পালাক্রমে আমাদের সংবাদ সংগ্রহের কেন্দ্রে গিয়ে খোঁচাতে থাকে; এর ফলে কোন-কোন সময়ে, আমাদের তরফ থেকে চেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব সত্ত্বেও রহস্যটা অকস্মাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে—হয়ত তা কোন মানুষের বা কোন জায়গার নাম, অথবা, বর্তমান ক্ষেত্রে যেমন, আমার পায়ের এই দুরবস্থার কারণ।

কাঠগুদামে রেল-পথ তৈরি হবার আগে যে বড় রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের দিকে যানবাহন চলাচল হত, আমাদের গেট থেকে বুয়র ব্রিজের সিধে লাইনে সেটা। ব্রিজ ছাড়িয়ে তিনশো গজ এগিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে বাঁ দিকে। এই মোড়ের ডান দিকের রাস্তাটা, সেই সময়ে, পাওয়ালগড়ের দাবানল-পথের সঙ্গে মিশেছিল। কয়েকশো গজ পর্যন্ত সেটা পাওয়ালগড়ের বর্তমান মোটর-চলা পথের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলেছে। বুয়র ব্রিজ থেকে পঞ্চাশ গজ দুরে কোটা রোড ডান দিক থেকে এসে বড় রাস্তায় মিশেছে। এই দুই রাস্তার সংযোগ-স্থল আর মোড়টার মাঝামাঝি রাস্তাটা একটা অগভীর নিচু জায়গা দিয়ে চলে গেছে। ভারি ভারি গরুর গাড়ি চলার ফলে এই নিচু জায়গাটা লাল ধুলোয় ভরে উঠেছে, ফলে ধুলো এখানে হয়ে উঠেছে ছ-ইঞ্চি পুরু। এই ধুলো এড়াবার জন্যে এই ধুলো-মাখা পথ আর বাঁ দিকের জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গার উপর দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে। মোড়টার কাছের দিকে ত্রিশ গজের মধ্যে রাস্তাটা, আর সরু পায়ে-চলা পথটা একটা ছোট সেতুর উপর দিয়ে চলে গেছে—এই সেতুর দেওয়াল এক ফুট পুরু আর আঠারো ইঞ্চি উঁচু, যাতে গরুর গাড়ি এখান থেকে নিচে পড়ে যেতে না পারে। বহু বছর হল এই সেতুটা অকেজো হয়ে রয়েছে।

এই সেতুর নিচের দিকে, অর্থাৎ সরু পায়ে-চলা পথটার দিকে রাস্তার সমান উঁচু লম্বায় চওড়ায় আট-দশ ফুট বালিভরা জমি।

আমার ধুলো-মাখা পা সম্বন্ধে যে কথা আমার মনে পড়ল সে হল, চা সেরে ওদের পেছন-পেছন চলতে চলতে আমি সেতুটার কয়েক গজ আগে পর্যন্ত এসে রাস্তাটা বাঁ দিক থেকে অতিক্রম করে ডান দিকে ছ-ইঞ্চি পুরু ধুলোর উপর দিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর রাস্তাটার ডান দিকের ধার ঘেঁসে সেতুটা পার হয়ে আবার রাস্তা অতিক্রম করে পায়ে-চলা পথটা ধরে চলেছিলাম। কেন তা করেছিলাম? বাড়ি থেকে বেরোনো থেকে হলদু গাছটার কাছে আমার লোকজনদের ধরে ফেলা পর্যন্ত আমি এমন একটা শব্দ পর্যন্ত পাই নি যাতে বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে, আর সেই অন্ধকার রাত্রে আমি চোখেও দেখিনি কিছু। কেন তবে আমি রাস্তাটা পার হলাম, আর কেনই বা আবার রাস্তাটা পেরিয়ে গেলাম ওদিকে?

এই বইয়ের গোড়ার দিকে বলেছি যে, যেদিন আমি ড্যান্সের বনশীর কারণ নির্ণয় করে জানলাম যে দুটো মসৃণ গাছের ঘর্ষণে এর সৃষ্টি, সেই থেকে জঙ্গলের যে-কোন অস্বাভাবিক শব্দ বা দৃশ্যের কারণ নির্ণয় করা আমার একটা নেশায় দাঁড়িয়েছে। এই তো আর-একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এর রহস্য উদ্ধার করতে হবে। তাই পরদিন ভোরে কোন গাড়ি চলার আগে আমি রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি থেকে ওরা সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে এবং গ্রামের গেটের কাছে আরও তিনজন ওদের দলে যোগ দেওয়ায় সে সংখ্যা দাঁড়ায় চোদ্দয়। বুয়র ব্রিজ পার হবার পর ওরা পায়ে-চলা পথটা ধরে একজনের পেছনে একজন এইভাবে এগিয়ে সেতুটা পার হয়। তারপর মোড়ে পৌঁছে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গিয়ে দাবানলপথ ধরে এগিয়ে চলে। এর কিছুক্ষণ পরে একটা বাঘ কোটা রোড ধরে এগিয়ে আসে, দুই রাস্তার সঙ্গমের সন্নিকটে একটা ঝোপের কাছে মাটিতে আঁচড় কাটে, তারপর বড় রাস্তাটা অতিক্রম করে পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে চলে। এখানে আমার লোকজনের পায়ের দাগের উপর বাঘটার পায়ের দাগ স্পষ্ট। বাঘটা এই পায়ে-চলা পথে ত্রিশ গজ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর আমি সেতুটার উপর গিয়ে পৌঁছই।

সেতুটা লোহার; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বাঘটা আমার সেটা অতিক্রম করার শব্দ পেয়েছিল, কারণ আমি নীরবতার দিকে কোনরকম দৃষ্টি না দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তার উপর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। যখন বাঘটা বুঝল যে আমি

কোটা রোড দিয়ে না গিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি সে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে এগিয়ে চলে, সেতুর কাছে এসে পথটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে বালি-ভরা জমিটার উপর শুয়ে ছিল,—পথটা থেকে তার মাথাটার দুরত্ব তখন এক গজ মাত্র। পায়ে-চলা পথটা ধরে আমি বাঘটার পিছু-পিছু চলেছিলাম. আর সেতুটার পাঁচ গজের মধ্যে এসে আমি ডাইনে মোড় ফিরেছিলাম ; তারপর ছ-ইঞ্চি পুরু ধুলো-ভরা রাস্তাটা পার হয়ে রাস্তার ডান কিনার ধরে এগিয়ে চলে আবার রাস্তাটা পার হয়ে পায়ে-চলা পথটায় গিয়ে পড়েছিলাম। এ সমস্তই আমি করেছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, যাতে আমায় বাঘটার এক গজের মধ্য দিয়ে না যেতে হয়।

আমার ধারণা, যদি আমি পায়ে-চলা পথটা ধরেই চলতাম তাহলেও সম্পূর্ণ নিরাপদে বাঘটার সামনে দিয়ে চলে যেতে পারতাম, যদি (ক) স্থির পায়ে হেঁটে চলে যেতাম, (খ) কোনরকম কথা না বলতাম, এবং (গ) হঠাৎ খুব বেশিরকম নড়াচড়া না করতাম। বাঘটার আমাকে হত্যা করবার কোন মতলব ছিল না বটে, কিন্তু তার সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় যদি আমি জঙ্গলের কোন শব্দ শোনবার জন্যে থামতাম, কিংবা কাশতাম বা হাঁচতাম বা নাক ঝাড়তাম, হয়ত তাহলে বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে আমায় আক্রমণ করতে পারত। আমার অবচেতন মন এই ঝুঁকিটা নিতে প্রস্তুত ছিল না। জঙ্গল-অনুভূতি এবার আমার সহায় হয়ে এই সম্ভাব্য বিপদের সান্নিধ্য থেকে আমায় সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই জঙ্গল-অনুভূতি যে কতবার আমায় বিপদ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু এতদিন জঙ্গলে বাসের মধ্যে মাত্র একবার আমি এক বন্য জন্তুর একেবারে সান্নিধ্যে এসে পড়েছিলাম। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, এই জঙ্গল-অনুভূতিই হোক বা আমার রক্ষী কোন দেবদূতই হোক, বার-বার চরম মুহূর্তে এ আমার নিরাপত্তা বিধান করে এসেছে।